প্রথম প্রকাশ ॥ অক্টোবর ॥ ১৯৬০

প্রকাশক ॥ প্রদীপ বসু । ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা ৭৩

মুদ্রক ॥ ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা

প্রচ্ছদ ॥ দিলীপ দাস

মণ্টোর গল্পের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় খুব সম্ভব ১৯৫৬-৫৭ সালে। তখন আমি পাকিস্তানে থাকতাম। সেই সময় মণ্টোর দু-চারটি গল্প পড়লেও আমাকে তেমনভাবে ভাবিয়ে তোলেনি বা আকৃষ্ট করেনি। হয়তো তা করেনি আমার বয়সের জন্যে। পরবর্তী সময়ে অনেক অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিকদের কাছে মণ্টোর কথা শুনেছি—জেনেছি। মণ্টোর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু অনেককে দুঃখিত করেছে—অভিভূত করেছে। বলেছেন আমরা নীলকণ্ঠকে হারালাম। হ্যাঁ, মণ্টো ছিলেন নীলকণ্ঠ। তিনি সমাজের বিষকে আকণ্ঠ পান করে নিজের দেহ এবং মনে নিয়েছেন সেই বিষের জ্বালা। আর সেই বিষ অমৃত হয়ে তাঁর কলম দিয়ে নির্ঝরিণীর মতো প্রবাহিত হয়েছে। এই বিষ পান করে মণ্টো আত্মসুখে সমাহিত হয়ে থাকেননি। বরং ডমরু বাজিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করেছেন—পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছেন।

মণ্টোকে আমি পরবর্তী সময়ে এইভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাই তাঁর অশ্লীলতা ব্যঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর শ্লেষ তাই বর্শা ফলকের মতো মূক—বধির হৃদয়কে এফোঁড় ওফোঁড় করেছে। এফোঁড় ওফোঁড় করে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর ব্যঙ্গ—তাঁর শ্লেষকে অশ্লীল বলে কে উড়িয়ে দিতে সাহস করবে? এমন হিম্মত কার আছে?

শুধু সামাজিক অসাম্য অনৈতিকতা নিয়ে তিনি তোলপাড় করেননি। চলে গিয়েছেন তার কারণের অনেক গভীরে। যেখানে সততঃ কাজ করছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতৃত্বের ভণ্ডামী তার মূল ধরে টান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যে গান্ধীবাদের নির্বীর্য মতাদর্শ কয়েক দশক ধরে স্বাধীনতার উদগ্র বাসনাকে ছিন্নভিন্ন করেছে—তাকে বিপথে চালিয়েছে এবং তার জঙ্গীপনাকে স্টেরেলাই-জেশন করেছে এবং এখনও করে চলেছে তার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে তিনি এতটুকু সাহস হারাননি। বরং সেই মতাদর্শের ভণ্ডামী—বদমাইশির বিরুদ্ধে কলম ধরতে তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক সততা এবং নিষ্ঠা।

এই চেতনা নিষ্ঠা এবং সততা তাঁর লেখার ক্ষমতায় জুগিয়েছে প্রেরণা। তাই মণ্টোকে আমরা নেগেটিভ থেকে পজেটিভে উত্তরিত হতে দেখি। এই নেগেটিভকে তিনি এমনভাবে রূপান্বিত করেছেন যেখান শুধু পজেটিভের ক্লেদাক্ত মুখকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে পাঠককে। মণ্টোর পাঠককে হতে হবে তাই সমাজ সচেতন।

এই বিচিত্র্যময় সমাজের বৈচিত্র্যময় মানুষকেই মণ্টো তুলে এনেছেন। যে মানুষদের সঙ্গে সচারাচর আমাদের পরিচয় নেই। পরিচয় নেই তাঁর কারণ আমরা ভদ্রজনরা এই ভিন্ন দেশে চলা-ফেরা করতে ভয় পাই—পাছে তাদের ছায়া আমাদের স্পর্শ করে অস্পৃশ্য—অপবিত্র করে দেয়। কিন্তু মণ্টো এই ভিন্ন দেশের ভিন্ন মানুষের মধ্যে বুক টানটান করে হেটেছেন। আর এই ভিন্নদেশের ভিন্ন মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-বেদনা, ক্ষোভ-জ্বালাকে একান্ত নিজের করে নিয়েছেন। নীলকণ্ঠের মতো পান করেছেন তাদের দেওয়া সেই বিষকে। এই বিষের জ্বালাই অল্প-বিস্তর ছড়িয়ে আছে এই ক্ষুদ্র সংকলনে। ছড়িয়ে আছে অমৃতও।

মণ্টোর জন্ম পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রাম সমরালাতে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি বোম্বাই-এ কাটান। সেই সময় চলচ্চিত্রের জন্যে বেশ কিছু গল্প লেখেন। দেশ বিভাগের পর তিনি লাহোরে যান। সেখানেই ১৯৫২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। উর্দু সাহিত্যের অন্যতম কথা-শিল্পী কৃষণচন্দর ছিলেন তাঁর অন্যতম বন্ধু। তিনি স্বয়ং ছিলেন তাঁর গল্পের একজন দরদী পাঠক। বলেছিলেন, মণ্টোর একটি গল্প 'ক্ষত'-এর বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত গল্প দিয়ে দিতে পারি। এ শুধু মণ্টোর পক্ষেই লেখা সম্ভব। আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলব মণ্টোর 'ক্ষত' আমাদের সমাজেরই ক্ষত। যেখান দিয়ে ঝরছে পুচ আর দুষিত রক্ত। এই ক্ষতকে নিরাময় করে তুলবে আজকের সমাজ বিপ্লবের কর্মীরা। মণ্টো সচেতন বা অচেতনভাবে তুলে দিতে চেয়েছেন সেই দায়িত্ব আমাদের হাতে—শাহজাদা গুলাম আলী বা নিগারের হাতে নয়।

কমলেশ সেন

॥ সূচীপত্র ॥

টোবা টেকসিং

দেশ বিভাগের দু-তিন বৎসর পর পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের সরকারের খেয়াল হল কয়েদীদের মতো পাগলদের আদান প্রদান হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ যে সব মুসলমান পাগল হিন্দুস্থানের পাগলা গারদে আছে তাদের পাকিস্তানে এবং যে সব হিন্দু ও শিখ পাকিস্তানের পাগলা গারদে আছে তাদের হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জানি না এ ঠিক ছিল কি বেঠিক ছিল। যাই-ই হোক, বুঝদার মানুষের রায় অনুসারে উচ্চস্তরের কনফারেন্স হল এবং শেষে এক দিন পাগলদের আদন-প্রদানের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালানো হলো। যে সব মুসলমান পাগলদের আত্মীয়-স্বজন হিন্দুস্থানে আছে তাদের সেখানেই রাখা ঠিক হল। আর পাকিস্তান থেকে যেহেতু সব হিন্দু এবং শিখ হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে তাই কাউকেই আর এখানে রাখার কথাই ওঠে না। যত হিন্দু এবং শিখ পাগল ছিল তাদের পুলিশের পাহারায় সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হল। ওদিককার কোন খবর নেই। কিন্তু এ দিকে লাহোরের পাগলা গারদে এই আদান-প্রদানের খবর পৌছলে খুব মজার মজার ঘটনা ঘটল। এক মুসলমান পাগল, যে বারো বৎসর ধরে প্রতিদিন নিয়মিত 'জমিদার' পত্রিকা পড়ে আসছে, তাকে তার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করল, "মৌলভী সাহাব, এই পাকিস্তান বস্তুটা কি ?" মৌলভী সাহেব খুব গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করে বলল, "হিন্দুস্থানের মধ্যে এ এমন এক জায়গা যেখানে খুর তৈরী হয়।"

মৌলভী সাহেবের উত্তর শুনে তার বন্ধু আর কোন কথাই বলল না।

একজন শিখ পাগল আর একজন শিখ পাগলকে জিজ্ঞেস করল, "সর্দারজী, আমাদের হিন্দুস্থানে কেন পাঠানো হচ্ছে ? আমার তো ওখানকার ভাষা জানা নেই।"

অন্য শিখ পাগলটি হেসে বলল, "আমার কিন্তু হিন্দুস্থানের ভাষা জানা আছে। তবে হিন্দুস্থানীরা খুব ডাঁটের মাথায় চলা-ফেরা করে।"

একদিন এক মুসলমান পাগল স্নান করতে করতে এমন জোড়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিল যে, পা পিছলে সে শানের ওপর পড়ে বেহুশ হয়ে গেল। এমন কিছু পাগল ছিল যাদের ঠিক পাগল বলা যায় না। এদের অধিকাংশই ছিল খুনী। এই সব খুনীদের সঙ্গে জড়িত অফিসাররা ফাঁসীর দড়ি থেকে তাদের বাঁচানোর জন্যে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে এখানে পাঠিয়েছে।

এরা অবশ্য কিছু কিছু বোঝে, দেশ বিভাগ কেন হয়েছে এবং পাকিস্তান কি। কিন্তু সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তারাও বিশেষ কিছু জানে না। খবরের কাগজ থেকে সমস্ত ঘটনা আঁচ করা সম্ভব নয়। আর পাহারাদার সিপাইরাও অজ্ঞ এবং তাদের ব্যবহার ভীষণ রুক্ষ। ওদের আলাপ-আলোচনা থেকে কোন কিছুই বেরিয়ে আসে না। তারা কেবল এতটুকুই জানে মুহম্মদ আলী জিন্না নামে একজন মানুষ আছেন, যাঁকে কায়েদ-ই-আজম বলা হয়। ইনি মুসলমানদের জন্যে এক পৃথক দেশ বানিয়েছেন—যার নাম পাকিস্তান। কিন্তু এই পাকিস্তান কোথায় আছে ? এর উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। কারণ পাগলা গারদের এরা সবাই উন্মাদ। যাদের মাথা একেবারে বিগড়ে যায়নি, তাদের চিন্তা তারা পাকিস্তানে আছে, না হিন্দুস্থানে আছে। যদি হিন্দুস্থানে থাকে তবে পাকিস্তান কোথায়, আর যদি পাকিস্তানে থাকে তবে এই জায়গা কিছুদিন আগেও হিন্দুস্থান ছিল। একজন পাগলা হিন্দুস্থান পাকিস্তান, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের এমন চড়কি পাকের মধ্যে পড়ল

যে তার মাথা আরো বিগড়ে গেল। ঝাঁট দিতে দিতে সে একদিন এক গাছের ডালে বসে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের মৌলিক সমস্যার ওপর লাগাতার দু'ঘণ্টা ভাষণ দিল। সিপাইরা তাকে নীচে নামতে বললে সে আরো ওপরের ডালে চড়ে বসল। তাকে ধমকানো এবং ভয় দেখানো হলে সে বলল, "আমি হিন্দুস্থানেও থাকতে চাই না, পাকিস্তানেও না। আমি এই গাছের ওপরেই থাকব।"

বুঝিয়ে-সুজিয়ে তার রাগ ঠাণ্ডা করা হলে সে গাছ থেকে নেমে এসে হিন্দু এবং শিখ বন্ধুদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তাকে ছেড়ে এরা সব হিন্দুস্থানে চলে যাবে এই চিন্তায় তার মন দুঃখে ভরে উঠল।

এখানে একজন মুসলমান এম. এস. সি. পাশ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার পাগল ছিল। অন্যান্য পাগলদের থেকে তার একটু বিশেষত্ব ছিল। বাগানের বিশেষ এক অংশে সে দিন-ভর ঘুরে বেড়াত, হঠাৎ-ই তার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখা দিল। সে তার সমস্ত জামা-কাপড় খুলে পাহারাদারকে দিল এবং উলঙ্গ হয়ে সারা বাগান ঘুরে বেড়াতে লাগল।

চনয়ুটের এক মুসলমান পাগল, যে উন্মাদ হওয়ার আগে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল, হঠাৎ-ই সে স্নান-করা বন্ধ করে দিল। তার নাম ছিল মুহম্মদ আলী। একদিন সে তার জানালা দিয়ে ঘোষণা করল সে মুহম্মদ আলী জিন্না। তাকে দেখে একজন শিখ পাগল মাস্টার তারা সিং হয়ে গেল। সামনা-সামনি হলে খুনো-খুনীর ভয় ছিল বলে দুর্ধর্ষ পাগলদের পৃথক পৃথক সেলে বন্ধ করে রাখা হল।

লাহোরের এক তরুণ হিন্দু উকিল, যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পাগল হয়েছিল—সে যখন শুনল অমৃতসর হিন্দুস্থানে পড়েছে তখন তার খুব কষ্ট হল। কারণ এই শহরের এক হিন্দু তরুণীর সঙ্গে তার এক সময় প্রেম ছিল। যদিও সেই তরুণী উকিলকে আঘাত দিয়েছিল

তবুও সে পাগলা গারদের এই পরিবেশে থেকেও তাকে ভুলতে পারেনি। তাই সে হিন্দু এবং মুসলমান সেই সব নেতাদের গালা-গালি করত যারা একজোট হয়ে হিন্দুস্থানকে দু' টুকরো করেছে। তার প্রেমিকা হিন্দুস্থানী হয়েছে আর সে পাকিস্তানী।

আদান-প্রদানের কথা যখন শুরু হল, তখন অন্যান্য পাগলরা তাকে বুঝালো এ জন্যে তার দুঃখ করে লাভ নেই। যে হিন্দুস্থানে তার প্রেমিকা আছে সেখানে তাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু লাহোর ছাড়তে সে একেবারেই রাজী নয়। কারণ তার বিশ্বাস, অমৃতসরে তার প্রাকটিস চলবে না। ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে দু'জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাগল ছিল। তারা যখন বুঝতে পারল হিন্দুস্থানকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজরা চলে গিয়েছে, তখন তাদের খুব দুঃখ হল। তারা দু'জন লুকিয়ে লুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভীষণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল, পাগলা গারদে তাদের পোজিসন কি রকম হবে? ইউরোপিয়ান ওয়ার্ড থাকবে না তুলে দেওয়া হবে? ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে না? ডবল রুটির বদলে কি তাদের তন্দুরি খেতে হবে?

একজন শিখ ছিল—যাকে পাগলা গারদে দেওয়ার পর দীর্ঘ পনেরো বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। সব সময়েই তার মুখ দিয়ে এক বিচিত্র ভাষা বের হত "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি মংগ দি, দাল আও দি লালটেন।" দিনে বা রাত্রে কোন সময়েই সে শুতো না। পাহারাদাররা বলতো এই দীর্ঘ পনেরো বৎসরে সে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি। —শোয়ওনি। হ্যাঁ, কখনো কখনো বা কোন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াত। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তার পা দুটি সোজা হয়ে গিয়েছিল। দু' উরু ফুলে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ভীষণ কষ্ট সত্ত্বেও সে আরাম করত না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের পাগলদের আদান-প্রদান নিয়ে পাগলা গারদে যখন কোন আলাপ-আলোচনা হত তখন সে খুব

মনোযোগ দিয়ে তা শুনতো। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি মনে হয়, তখন সে উত্তর দিত, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি দাল আও দি, পাকিস্তান গভর্ণনেণ্ট।"

পরে সে আও দি পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের জায়গায় যোগ করল আও দি টোবা টেকসিং এবং সব পাগলদের জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল, যেখানে সে থাকত সেই টোবা টেকসিং কোথায়? কিন্তু তারা কেউ-ই জানত না টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। যারা তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত, তারা নিজেরাই চড়কি পাকে পড়ে যেত। শিয়ালকোট প্রথমে হিন্দুস্থানে ছিল, এখন শুনছে পাকিস্তানে। কে জানে, যে লাহোর এখন পাকিস্তানে আগামী কালই হয়তো তা হিন্দুস্থানে চলে যাবে—কিম্বা সারা হিন্দুস্থানই পাকিস্তান হয়ে যাবে। এমন কোন্ মানুষ আছে যে তার বুকে হাত রেখে বলতে পারে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান হঠাৎ একদিন লোপাট হয়ে যাবে না—আর দুনিয়ায় যার কোন নাম নিশানাই থাকবে না।

ঝড়ে পড়তে পড়তে এই শিখ পাগলের মাথায় খুব অল্প চুলই আর অবশিষ্ট ছিল। স্নান করা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। তার দাড়ি আর মাথার চুল জট পাকিয়ে গিয়েছিল। ফলে তার চেহারা ভয়ানক দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই মানুষটি ছিল একেবারে সোজা। পনেরো বৎসরে সে একদিনও কারু সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করেনি। পাগলা গারদের পুরনো চাকর তার সম্পর্কে শুধু এই টুকুই জানে, টোবা টেকসিং-এ একদিন তার জমিদারী ছিল। সে ছিল পয়সা-ওয়ালা জমিদার। কিন্তু হঠাৎ-ই তার মাথার গণ্ডোগোল হয়। তাই তার আত্মীয়রা মোটা মোটা লোহার শিকলে বেঁধে তাকে এখানে নিয়ে আসে। মাসে একবার তারা তার খোঁজ-খবর নিতে আসত। কিন্তু যেদিন থেকে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের গণ্ডোগোল শুরু হল, সেদিন থেকে তারা আর আসে না।

তার নাম ছিল শবন সিং। কিন্তু সবাই তাকে টোবা টেকসিং বলত। সে আদৌ জানত না আজ কোন্ দিন, কোন্ মাস, কোন্ বৎসর। কিন্তু প্রতি মাসে যে সময় তার আত্মীয়-স্বজনরা তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসত তখন সে আপনার থেকেই বুঝতে পারত। সে পাহারাদারদের বলত তার সাক্ষাৎ-এর দিন আসছে। ঐ দিন সে খুব ভালোভাবে স্নান করত, গায়ে বেশ করে সাবান মাখতো আর মাথায় তেল দিয়ে চিরুনি করত। নিজের জামা কাপড় সে কোন দিনই বের করত না, কিন্তু সেদিন সে তা বের করে পরত। আর সেজে-গুজে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। তারা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, সে কোন উত্তরই দিত না। কখনো কখনো শুধু বলত, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি লালটেন।"

তার একটি মেয়ে ছিল —প্রতিমাসে এক আঙুল করে বেড়ে উঠতে উঠতে আজ সে পনেরো বৎসরের যুবতীতে পরিণত হয়েছে। শবন সিং তাকে চিনতেই পারেনি। যখন সে বাচ্চা ছিল তখন সে তার বাবাকে দেখে খুব কাঁদতো। আর যুবতী হওয়ার পর তার চোখ দিয়ে শুধু অঝোরে ঝরে পড়ত অশ্রুধারা।

পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানের কাহিনী শুরু হলে সে অন্য পাগলদের জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল, টোবা টেকসিং কোথায়? সন্তোষজনক কোন উত্তর না পেয়ে তার চিন্তা দিন দিন বাড়তে লাগল। এখন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎও হয় না। আগে সে নিজের থেকেই বুঝতে পারত তারা তাকে দেখতে আসছে। হৃদয় তাকে তাদের আসার খবর জানিয়ে দিত। এখন সেই হৃদয়ের আওয়াজটুকুও তার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

তার খুব ইচ্ছে করত যারা তাকে ভালোবাসত, তার জন্যে ফলমিঠাই আর কাপড় নিয়ে আসত —তারা আসুক। সে যদি তাদের জিজ্ঞেস করত, টোবা টেকসিং কোথায় তবে তারা নিশ্চয় সত্যি কথাই বলত। সে জানতে পারত টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না

হিন্দুস্থানে। সে জানে যেখানে তার জমিদারী ছিল সেই টোবা টেকসিং থেকেই তারা এখানে আসত।

পাগলা গারদে আর একজন উন্মাদ ছিল সে নিজেকে খোদা বলে জাহির করত। একদিন শবন সিং তাকে জিজ্ঞেস করল, টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। কিন্তু সেই খোদা তার অভ্যাস মতো হো হো করে হেসে বলল, "টোবা টেকসিং পাকিস্তানেও নয়, হিন্দুস্থানেও নয়। কারণ আমি এখনও হুকুম জারী করিনি।"

শবন সিং এই খোদাকে কয়েকবার অনুনয়-বিনয় করে বলল, "তুমি হুকুম দিয়ে দাও না, তা হলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।" কিন্তু খোদা ভীষণ ব্যস্ত ছিল, কারণ তার আরো কয়েকটি হুকুম জারী করার বাকী ছিল। একদিন শবন সিং তার ওপর ভীষণ চটে গিয়ে বলল, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি দাল আও ওয়াহে গুরু দি খালসা এ্যাণ্ড ওয়াহে গুরুজী দি ফতহ—জো বোলো সো নিহাল সত্ শ্রী অকাল।

তার এই কথার অর্থ ছিল তুমি মুসলমানদের খোদা —তুমি যদি শিখদের খোদা হতে তবে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনতে।

আদান-প্রদানের কয়েকদিন আগে টোবা টেকসিং-এর এক মুসলমান বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এল। এর আগে সে কোন দিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। শবন সিং তাকে দেখে একদিকে সরে দাঁড়াল এবং ফিরে যেতে লাগল। কিন্তু সিপাইরা তাকে ধরে বলল, "তোমার বন্ধু ফজলুদ্দীন।"

শবন সিং ফজলুদ্দীনকে এক নজর দেখে বিড়-বিড় করে কিছু বলতে লাগল। ফজলুদ্দীন এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি, তোমার বাড়ির সবাই ভালোভাবেই হিন্দুস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব সাহায্য করার তা করেছি। কিন্তু তোমার মেয়ে রূপ কাউর…"

বলতে বলতে ফজলুদ্দীন থেমে গেল। শবন সিং কোন কিছু চিন্তা করতে লাগল। —"আমার মেয়ে রূপ কাউর!"

ফজলুদ্দীন থেমে থেমে বলতে লাগল, "হ্যাঁ ···ও —ও · ঠিক-ঠাক আছে ···ওদের সাথেই চলে গিয়েছে।"

শবন সিং চুপ করে থাকল। ফজলুদ্দীন বলতে লাগল, "ওরা আমাকে তোমার খোঁজ-খবর নিতে বলেছে। আমি শুনেছি তুমি হিন্দুস্থানে যাচ্ছ—ভাই বলবীর সিং এবং ভাই বধওয়া সিংকে আমার সেলাম দিও —আর বোন অমৃত কাউরকেও। ভাই বলবীর সিংকে বলো সে যে দুটি বাদামী রঙের মোষ ছেড়ে গিয়েছে তার মধ্যে একটি মর্দা বাচ্চা দিয়েছে আর একটি মাদী বাচ্চা। কিন্তু চোদ্দ দিনের মাথায় মাদী বাচ্চাটা মরে গিয়েছে। তোমাদের জন্যে আমার কিছু করার থাকলে বলো, আমি আমার সাধ্যি মতো করব। তোমার জন্যে সামান্য একটু মরুণ্ডে নিয়ে এসেছি।"

শবন সিং মরুণ্ডের পুটলি নিয়ে তার পাশে যে সিপাইটা দাঁড়িয়ে ছিল তার হাতে দিল। ফজলুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করল, "টোবা টেকসিং কোথায়?" ফজলুদ্দীন আশ্চর্যের সঙ্গে বলল, "কোথায়? কেন যেখানে ছিল সেখানেই আছে।"

শবন সিং আবার জিজ্ঞেস করল, "পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে?" ফজলুদ্দীন থতমত খেয়ে বলল, "হিন্দুস্থানে —না,না পাকিস্তানে।" শবন সিং বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল —"ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি দাল আও দি পাকিস্তান এ্যাণ্ড হিন্দুস্থান অফ্ দি দুর ফিটে মুঁ।"

আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে আসা-যাওয়ার পাগলদের নামের তালিকা এসে গিয়েছিল এবং আদান-প্রদানের তারিখও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন লাহোরের পাগলা গারদ থেকে লরি বোঝাই করে হিন্দু ও শিখ পাগলদের সীমান্তের দিকে পাঠানো হল তখন

বেশ শীত পড়ে গিয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসাররাও পাগলদের সঙ্গে ছিলেন। উভয় পক্ষের সুপারেনটেনডেণ্ট পরস্পরের সঙ্গে দেখা করলেন, এবং অফিসিয়াল কাজ কর্ম শেষ হওয়ার পর আদান প্রদান শুরু হয়ে গেল। আদান-প্রদান সমস্ত রাত্রি ধরে চলল।

পাগলদের লরি থেকে নামানো এবং অন্য অফিসারদের হেফাজতে দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল; অনেকে তো লরি থেকে নামতেই চাইছিল না। যারা লরি থেকে নেমেছিল তাদের সামলানো ছিল এক সাধ্যাতীত ব্যাপার। কারণ তারা এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। যারা একেবারে উলঙ্গ ছিল তাদের কাপড় পড়াতে গেলে তা-টেনে খুলে ফেলছিল। কেউ কেউ খিস্তি খাস্তা করছিল, কেউ বা গান গাইছিল। নিজেদের মধ্যে মারপিট ঝগড়াঝাটিও পুরোদমে চলছিল —কান্নাকাটি করছিল। কান পেতে শোনা যাচ্ছিল না। উন্মাদ মেয়েদের গণ্ডোগোল ছিল একটু ভিন্ন ধরনের —সর্দি তাদের এতো বেশী ছিল যে দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে বাজছিল।

অধিকাংশ —পাগলই এই আদান-প্রদানকে মোটেই পছন্দ করছিল না। তারা বুঝতেই পারছিল না নিজেদের জায়গা থেকে তুলে তাদের কোথায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে! যারা অল্প-বিস্তর আন্দাজ করতে পারছিল তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'—'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছিল। দু-তিন বার হাতা-হাতি হতে হতে থেমে গেল, কারণ কোন-কোন মুসলমান এবং শিখের এই ধ্বনি শুনে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে শবন সিং-এর পালা এল। তাকে যখন অন্য পারে পাঠানের জন্যে অফিসার লেখা-লেখি করছিলেন তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "টোবা টেকসিং কোথায়? পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে?" তার প্রশ্ন শুনে অফিসার হেসে বললেন, "পাকিস্তানে।"

অফিসারের উত্তর শুনে শবন সিং ছিটকে সরে গেল। তারপর

ছুটতে ছুটতে তার পেছনে যে সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কাছে এসে হাজির হল। পাকিস্তানের সিপাইরা তাকে জোড় করে টেনে ওপারে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শবন সিং এক পা-ও এগুতে চাইল না। চীৎকার করে বলতে লাগল, "টোবা টেকসিং কোথায় —ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি দাল দি আও টোবা টেকসিং এ্যাণ্ড পাকিস্তান।"

তাকে খুব বোঝানো হল, "ছ্যাখো, টোবা টেকসিং এখন হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে। যদি এখনও না গিয়ে থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি তাকে পাঠানো হবে।" কিন্তু সে কোন কথাই শুনল না। তাকে জোড় করে ওপারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু শবন সিং হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের মাঝখানে একটি জায়গায় তার সোজা পা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এমনভাবে সে দাঁড়াল যেন কোন শক্তিই তাকে এখান থেকে একচুল সরাতে পারবে না। শবন সিং খুব রুগ্ন ছিল বলে কেউ আর তার ওপর জবরদস্তি করল না। তাকে ঐখানে ঐভাবে ছেড়ে দিয়ে আদান-প্রদানের কাজ চলতে লাগল।

সূর্য ওঠার ঠিক আগে ঐ জায়গায় তেমনি দাঁড়িয়ে শবন সিং হঠাৎ ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল। দুই দিককার অফিসাররা চীৎকার শুনে তার দিকে ছুটে এল। তারা দেখল, যে মানুষ দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, সে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পায়ের কাছে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুস্থানের পাগলরা আর মাথার দিকে সার দিয়ে পাকিস্তানের পাগলরা। আর দু' সারির মাঝখানে—যে জায়গার কোন নাম নেই সেখানে পড়ে আছে টোবা টেকসিং।

হেরে চলে গেল

কেউ কেউ শুধু জিতেই আনন্দ পায়, কিন্তু ও জিতে আবার তা হেরে গিয়ে খুশী হয়॥

জিততে ওর খুব মুশকিল হয় না, কিন্তু হারতে কয়েকবার ওকে খুব মুশকিলে পড়তে হয়। প্রথমে ও ব্যাঙ্কে চাকরি করত, কিন্তু যখন বুঝল যে ওর অগাধ ধন-দৌলত দরকার তখন ওর বন্ধু আর আত্মীয়-স্বজনরা ওর এই খেয়ালকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ও একদিন ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে বোম্বাই চলে গেল এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে লাগল।

বোম্বাইতে পয়সা উপার্জনের বেশ কয়েকটা পথ ওর কাছে খোলা ছিল, কিন্তু ও ফিল্মের দুনিয়াকেই ঠিক করে নিল। এতে পয়সা ছিল, ইজ্জতও ছিল। এই দুনিয়াতে বিচরণ করে ও দু'হাতে পয়সা লুটতে পারে এবং উড়াতেও পারে। তাই ও এই জায়গাতেই খেলতে শুরু করল।

লাখ-লাখ টাকা নয়, কোটি-কোটি টাকা ও উপার্জন করে উড়িয়ে দিল। উপার্জন করতে ওর যে সময় লেগেছিল উড়িয়ে দিতে তা লাগেনি। ফিল্মের জন্যে একটি গান লিখল। লিখে লাখ টাকা পেয়ে গেল। কিন্তু এই এক লাখ টাকা বেশ্যাখানায়, বাইজির মহফিলে, ঘোড়-দৌড়ের মাঠে এবং জুয়ার আড্ডায় উড়িয়ে দিতে ওর বেশ কিছু দিন লাগল।

ও একটি ফিল্ম তৈরি করল। তাতে দশ লাখ টাকা লাভ হল। এই টাকা কিভাবে উড়ানো যায় ওর কাছে তা এক সমস্যা হিসেবে দেখা দিল। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে পদস্খলনের ব্যবস্থা ও তৈরি

করে নিল। ও তিনটি গাড়ি কিনল—একটা নতুন, আর দুটো পুরনো। এই পুরনো গাড়ি দুটি যে অকেজো তা ও ভালোভাবেই জানত। এই গাড়ি দুটো ও বাড়ির বাইরে ফেলে রাখল যাতে ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে যায়। আর যেটা নতুন সেটা গ্যারেজে বন্ধ করে রাখল—ভাবটা যেন পেট্রোলের অভাবে চালাতে পারছে না। ট্যাক্সিই ওর কাছে ঠিক ছিল। ভোরে ট্যাক্সি নিত, মাইল খানেক যাওয়ার পর ট্যাক্সি থামাত। থামিয়ে কোন জুয়ার আড্ডায় ঢুকে পড়ত। দু-আড়াই হাজার টাকা হেরে পরদিন আড্ডা থেকে বাইরে বের হত। ট্যাক্সি বাইরে তেমনিই দাঁড়িয়ে রইত। ট্যাক্সিতে চড়ে বাড়ি যেত এবং ইচ্ছা করেই ট্যাক্সির ভাড়া দিতে ভুলে যেত। সন্ধ্যায় আবার বের হত, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলত, আরে বন্ধু, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ। অফিসে চল, তোমাকে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি···অফিসে পৌঁছে ও আবার ভাড়া দিতে ভুলে যেত। আর···

একটার পর একটা ওর ফিল্ম হিট হল। সাফল্যের যত রেকর্ড ছিল সব ওর কাছে ম্লান হয়ে গেল। টাকার পাহাড় জমে উঠল। সম্মান ও মর্যাদা আকাশকে স্পর্শ করল। ক্ষেপে গিয়ে ও আরও দু তিনটি ফিল্ম তৈরি করল, কিন্তু সেই ফিল্মগুলি হিট না করায় অসাফল্যের এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়াল। ওর এই অসাফল্য অন্যকে পথে বসাল। কিন্তু ও আবার সঙ্গে সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে নিল। যারা পথে বসেছিল তাদের ও ভরসা দিল, আর ও এমন ফিল্ম তৈরি করল, মনে হল তা যেন সোনার খনি।

নারী সম্পর্কিত ব্যাপারেও ওর হার-জিত এমনই চক্রাকারে চলত। কোন মহফিল বা কোন বেশ্যালয় থেকে একটি মেয়েকে তুলে আনল, তারপর তাকে সম্মানের উঁচু আসনে বসিয়ে দিল। এবং তার নারীত্বের সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হওয়ার পর ও তাকে এমন সুযোগ করে দিত যাতে ও অন্য কারো গলায় ঝুলে পড়ে।

বড় বড় পুঁজিপতি এবং সুন্দরী প্রেমিকাদের সঙ্গে ওকে মুখোমুখি হতে হত। ও এক হাত বাজি লড়ে যেত। রাজনীতির চাল চালত। এই কাঁটা-গুল্মে হাত দিয়ে ও নিজের পছন্দ মতো ফুল তুলে নিয়ে আসত। এবং পরদিনই নিজের কোটে লাগিয়ে কোন উদার মানুষকে সুযোগ দিত যেন সে এক ঝটকায় ফুলটা নিয়ে যায়।

এই সময় ও ফারস্ রোডের এক জুয়ার আড্ডায় লাগাতার দশ দিন ধরে যাওয়া-আসা শুরু করল—হেরে যাওয়া ওর ওপর জাঁকিয়ে বসেছিল। ও সবে খুব সুন্দরী আর সতেজ এক একট্রেসকে হারিয়েছিল এবং এক ফিল্ম তৈরি করে দশ লাখ টাকা বরবাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও ওর কোন আক্কেল হয়নি। এ দুটি জিনিসই অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ওর ধারণা যে ভুল তা এবার প্রমাণিত হল। তাই এবার ফারস্ রোডের জুয়ার আড্ডায় কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব করে এক বিশেষ অঙ্ক পর্যন্ত ও হারতে লাগল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় পকেটে দু'শ টাকা নিয়ে ও পবন পুলের দিকে চলে যেত। ওর ট্যাক্সি হাট করে খোলা ঘরের জানালার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত এবং বেশ কিছু দূর যাওরার পর এক ইলেকট্রিক পোস্টের কাছে এসে থেমে যেত। ও ট্যাক্সি থেকে নামত। নেমে তার পুরু কাঁচের চশমাটাকে একবার চোখের ওপর ঠিক ভাবে বসিয়ে নিত। তারপর ধুতির কোঁছা ঠিক করে একবার ডান দিকে—যেখানে লোহার শিকের ওধারে যে কুৎসিত মেয়ে মানুষটি ভাঙ্গা আয়না নিয়ে নিজের সাজ-গোজে ব্যস্ত থাকত সেদিকে তাকাত। তারপর তরতর করে দোতালার আড্ডায় উঠে যেত।

দশ দিন ধরে ও লাগাতার ফারস্ রোডের এই জুয়াখানায় দু'শ টাকা করে হারার জন্যে আসছে। কখনও কখনও দু-এক হাত খেলার পরই ওর এই দু'শ টাকা খতম হয়ে যেত, আবার কখনও হারতে হারতে ভোর হয়ে যেত।

এগারো দিনের দিন যখন ওর ট্যাক্সি ইলেকট্রিক পোস্টের কাছে এসে দাঁড়াল তখন ও ওর পুরু কাঁচের চশমাটা এবং ধুতির কোঁছা ঠিক করে নিয়ে এক নজর বাঁয়ে তাকাল। হঠাৎ ওর মনে হল গত দশ দিন ধরে ও এই কুৎসিত মেয়েমানুষটিকে দেখে আসছে। এই মেয়ে মানুষটি প্রতিদিনের মতো আজকেও ভাঙা আয়না সামনে নিয়ে একটি কাঠের চৌকির ওপর বসে সাজ-গোজে ব্যস্ত ছিল।

জানলার কাছে এগিয়ে এসে ও এই আধ বয়সী মেয়ে মানুষটিকে খুব মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দেখল তার গায়ের রঙ মিশ কালো কিন্তু চটকদার, থুতনির ওপর ছোট ছোট নীল রঙের সুই দিয়ে বিন্দি আঁকা। যে বিন্দিগুলো তার গায়ের চামড়ার রঙের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। তার দাঁতগুলোও কেমন বেঢপের। পান আর তামাকের ছোপ-ছোপ দাগ। ওর অবাক লাগল এই মেয়ে মানুষটির কাছে কে আসে।

ও জানালার আরও কাছে এগিয়ে গেলে সেই কুৎসিত মেয়ে মানুষটি একটু মুচকি হাসল। আয়না একদিকে সরিয়ে রেখে সে খিস্তি দিয়ে বলল, "কি সেঠ, থাকবে ?"

ও আরও ভালোভাবে সেই মেয়ে মানুষটির দিকে তাকাল। এই বয়সেও সেই মেয়ে মানুষটির আশা ছিল তার খদ্দের আছে। ও খুব আশ্চর্য হল। তাই ও তাকে জিজ্ঞেস করল, "বাই, তোমার বয়স কত ?"

প্রশ্ন শুনে মেয়ে মানুষটির বুক ধড়াস করে উঠল। মুখ কুচকিয়ে সে মারাঠী ভাষায় এক গালি দিল। ও নিজের ভুল বুঝতে পারল। বুঝে বেশ লজ্জার সঙ্গে বলল, "বাই, আমাকে মাফ কর। আমি এমনিই তোমাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি প্রতিদিন সাজ-গোজ করে বসে থাক বলে আমার খুব আশ্চর্য লাগে। তোমার কাছে কেউ আসে ?"

মেয়ে মানুষটি এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ও আবার

নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি বাই ?"

মেয়ে মানুষটি পর্দা সরিয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে ছিল, কিন্তু ওর প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "গঙ্গু বাই।"

"গঙ্গু বাই, তুমি প্রতিদিন কত কামাও ?"

ওর কণ্ঠে সহানুভূতি এবং দরদ ছিল। গঙ্গু বাই জানালার শিকের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "ছ-সাত টাকা, কোন কোন দিন কিছুই কামাতে পারি না।"

—"ছ-সাত টাকা, আর কোন কোন দিন কিছুই কমাতে পারি না" গঙ্গু বাই-এর কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে ওর দু'শ টাকার কথা মনে হল। যে দু'শ টাকা ওর পকেটে ছিল এবং যা হারার জন্যেই ও সঙ্গে করে এনেছিল। হঠাৎই ওর মনে এক ইচ্ছা জেগে উঠল। ও গঙ্গু বাইকে বলল, "দেখ গঙ্গু বাই, তুমি তো প্রতিদিন ছ-সাত টাকা কামাও—তুমি আমার কাছ থেকে দশ টাকা করে নিও।"

—"কেন থাকার জন্যে ?"

—"না,…মনে কর আমি থাকার জন্যেই তোমাকে এই টাকা দিচ্ছি।" গঙ্গু বাইকে এই কথা বলে ও পকেটে হাত ঢোকাল এবং দশ টাকার একটা নোট বের করে শিকের ফাঁক দিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই নাও।"

গঙ্গু বাই নোটটা নিয়ে নিল। কিন্তু সে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

ও বলল, "গঙ্গু বাই, আমি তোমাকে প্রতিদিন এই সময় দশ টাকা করে দিয়ে যাব। কিন্তু একটা শর্ত আছে।"

"—শর্ত ?"

—"শর্ত হচ্ছে, দশ টাকা নেয়ার পর তুমি খাবার টাবার খেয়ে ঘরে শুয়ে থাকবে…রাত্রে যেন তোমার ঘরে বাতি জ্বলতে না দেখি।"

গঙ্গু বাই-এর ঠোঁটে এক অদ্ভুত দুঃখের হাসি খেলে গেল।

—"হাসির কথা নয়, আমি আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।"

এই কথা বলে ও ওপরে জুয়ার আড্ডায় চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ও ভাবল এই টাকাতো আমি হারার জন্যেই নিয়ে এসেছি। দু'শ টাকা নয়, একশ নব্বুই টাকা হারব।

কয়েকটি দিন এমনি ভাবে চলে গেল। প্রতিদিন ওর ট্যাক্সি ঠিক সন্ধ্যার সময় ইলেকট্রিক পোস্টের কাছে এসে থামত। দরজা খুলে ও বাইরে বেরিয়ে আসত। এবং পুরু কাঁচের চশমা দিয়ে ডান দিকে গঙ্গু বাই-এর দিকে তাকাত। দেখত গঙ্গু বাই জানলার ধারে চৌকির ওপর বসে আছে। নিজের ধূতির কোছা ঠিক করতে করতে ও জানলার কাছে এগিয়ে যেত এবং গঙ্গু বাই-এর দিকে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিত। গঙ্গু বাই নোটটা মাথায় ঠেকিয়ে কুর্নিশ করত। আর ও একশ' নব্বুই টাকা হারার জন্যে দোতলায় উঠে যেত। এর মধ্যে দু-তিন বার জুয়ায় হেরে রাত্রি এগারোটা-বারোটা বা দুটো-তিনটার সময় ও নীচে এসে দেখেছে গঙ্গু বাই-এর ঘর বন্ধ।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও দশ টাকা দিয়ে দোতলায় গেল। কিন্তু দশটা বাজতে না বাজতেই ওর ছুটি হয়ে গেল। সেদিন তাসের পাতা এমন পড়ল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওর একশ' নব্বুই টাকা হাওয়া হয়ে গেল। দোতলা থেকে নেমে ও যখন ট্যাক্সিতে বসতে গেল তখন দেখল গঙ্গু বাই-এর ঘরের দরজা খোলা। আর সে জানালার ধারে চৌকির ওপর বসে খদ্দেরের জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ও গঙ্গু বাই-এর ঘরের দিকে এগুলো। ওকে দেখে গঙ্গু বাই ঘাবরিয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ও জানলার ধারে পৌঁছে গিয়েছিল।

—"গঙ্গু বাই, একি ব্যাপার?"

গঙ্গু বাই ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

—"খুব আফসোসের কথা, তুমি তোমার কথা রাখনি।...আমি তোমাকে বলেছিলাম, রাত্রে যেন তোমার ঘরে বাতি জ্বলতে না দেখি। কিন্তু তুমি এখানে এইভাবে বসে আছ!"

ওর কণ্ঠে দুঃখ ছিল। গঙ্গু বাই চিন্তায় পড়ে গেল।

—"তুমি খুব খারাপ"—বলে ও যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

গঙ্গু বাই বলল, "সেঠজী, দাঁড়াও।"

ও দাঁড়িয়ে পড়ল। গঙ্গু বাই ধীরে ধীরে, এক একটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি খুব খারাপ। কিন্তু এখানে সাচ্চা কে! ...সেঠজী তুমি দশ টাকা দিয়ে একটি বাতিই নিভিয়েছ।...একটু তাকিয়ে দেখতো কত বাতি জ্বলছে।"

ও একদিকে সরে দাঁড়াল এবং জানালা-লাগানো সার সার ঘর-গুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলাল। একটি নয়, অসংখ্য সার সার বাতি রাত্রির ধূসর পরিবেশে টিম টিম করে জ্বলছে। "তুমি কি এই সমস্ত বাতি নেভাতে পারবে?"

ও ওর চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে গঙ্গু বাই-এর মাথার ওপর লটকানো বাল্ব-এর দিকে তাকাল। তারপর গঙ্গুবাই-এর ধূসর শরীরের দিকে ওর ঘাড় হেঁট করে বলল, "না, পারব না গঙ্গু বাই, পারব না।"

ও যখন ট্যাক্সিতে উঠে বসল, তখন ও অনুভব করল ওর পকেটের মতো ওর হৃদয়ও শূন্য—খালি।

লাইসেন্স

অব্বু কোচোয়ান ছিল খুবই সুপুরুষ। তার টাঙ্গার ঘোড়াও ছিল শহরের এক নম্বর ঘোড়া। যে-সে সওয়ারি সে কখনও নিত না। বাধা ধরা খদ্দের ছিল। এই বাধা-ধরা খদ্দেরদের কাছ থেকে দিনে দশ-পনেরো টাকা পেলেই অব্বুর কাছে যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য কোচোয়ানদের মতো নেশা-ভাঙ সে করত না। সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে সেজে-গুজে থাকা সে খুব পছন্দ করত।

তার টাঙ্গা যখন ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে চলে যেত তখন আপনা-আপনি সবার চোখ তার টাঙ্গার ওপর গিয়ে পড়ত। "ঐ-যে ফুলবাবু অব্বু যাচ্ছে। দেখ কেমন ডাঁট নিয়ে বসে আছে। পাগড়িটা দেখ, কেমন তেরচা করে বেঁধেছে!"

লোকের চোখের এই ভাষা যখন অব্বু শুনত তখন তার ঘাড় এক আভিজাত্য বোধে ফুলে উঠত এবং তার ঘোড়ার চাল আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। ঘোড়ার লাগাম অব্বুর হাতে এমন কায়দায় ধরা থাকত, যেন তা ধরার কোন প্রয়োজনই নেই। মনে হত, ঘোড়া যেন বিনা-ইশারায় চলেছে। তার মালিকের হুকুমের কোন প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও এমন মনে হত, অব্বু আর তার ঘোড়া চুন্নী যেন অভিন্ন। যেন পুরো টাঙ্গাটাই একটি জীবন। আর এই জীবন অব্বু ছাড়া আর কে হতে পারে।

যে সব সওয়ারিদের অব্বু নিতে অস্বীকার করত তারা মনে মনে অব্বুকে গাল দিত। কেউ কেউ আবার অভিশাপও দিত,—"ভগবান যেন এর অহংকার নষ্ট হয়, টাঙ্গা ঘোড়া যেন নদীতে পড়ে।"

অব্বুর ঠোঁটের ওপর যে হাল্কা-হাল্কা গোঁফের রেখা ছিল, তাতে আত্মবিশ্বাসের এক মিষ্টিহাসি লেগে থাকত। তাকে দেখে কোন

কোন কোচোয়ান জ্বলে-পুড়ে মরত। অব্বুর দেখাদেখি কয়েকজন কোচোয়ান এদিক-সেদিক থেকে ধার-দেনা করে টাঙ্গা বানাল। টাঙ্গাকে পিতলের সাজ দিয়ে সাজাল। কিন্তু তবু তাদের টাঙ্গা অব্বুর সাজ-বাটের কাছে দাঁড়াতে পারল না। তাদের টাঙ্গা ঘোড়ার চেয়ে অব্বুর টাঙ্গা-ঘোড়াকে লোকে বেশী পছন্দ করত।

একদিন দুপুরে অব্বু এক গাছের ছায়ায় তার ঘোড়াকে বেঁধে টাঙ্গার ওপর বসে একটু ঝিমুচ্ছিল এমন সময় একটি শব্দ তার কানের কাছে গুনগুন করে উঠল। অব্বু চোখ মেলে তাকাল। দেখল একজন মহিলা টাঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অব্বু এক ঝলক তাকে দেখে নিল। সেই মহিলার উচ্চারিত যৌবন তার হৃদয়কে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। সে মহিলা ছিল না, ছিল ষোল সতেরো বৎসরের তরুণী। ছিপছিপে কিন্তু সুগঠন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কানে রূপোর ছোট ছোট দুল। সোজা সিঁথি। তীক্ষ্ণ নাক। আর নাকের ডগায় উজ্জ্বল তিল। পরনে লম্বা কামিজ আর নীল রঙের গারারা। মাথায় ওড়না।

মেয়েটি তারুণ্যের কণ্ঠে অব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "এই স্টেশন যেতে কত নেবে?"

অব্বুর ঠোঁটের মুচকি হাসি এক নিমেষে দুষ্টুমি হাসিতে পাল্টে গেল। বলল, "কিচ্ছু লাগবে না।"

মেয়েটির শ্যামবর্ণ মুখের ওপর লালিমা ছেয়ে গেল,—"কত নেবে স্টেশন যেতে?"

অব্বু চোখ দিয়ে তাকে অবগাহন করতে করতে বলল, "তোর কাছ থেকে আমি কি নেব রে! চলে আয়—টাঙ্গাতে বস।"

মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে তার হাত দুটি নিজের সুডৌল বুকের ওপর রেখে যতটুকু সম্ভব ঢাকার চেষ্টা করল। "তুমি কেমন ধরনের কথা বল?"

অব্বু হেসে বলল, "আয়, উঠে বস। তুই যা দিবি তাই নিয়ে নেব।"

মেয়েটি একটু চিন্তা করল। তারপর পাদানিতে পা দিয়ে টাঙ্গাতে উঠে বসল। বসে বলল, "জলদি স্টেশনে নিয়ে চল।"

অব্বু পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, "তোর খুব জলদি আছে, তাই না!"

—"হায়, হায়, তু···" মেয়েটি আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

টাঙ্গা ছুটতে লাগল···ছুটতেই লাগল। ঘোড়ার খুড়ের নীচ দিয়ে কয়েকটি রাস্তা ছুটে পার হয়ে গেল। মেয়েটি লজ্জায় জড়-সড় হয়ে বসে রইল। অব্বুর ঠোঁটে দুষ্ট দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল। বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছিল বলে মেয়েটি ভয়ার্ত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখনও স্টেশন আসেনি?"

অব্বু বেপোরয়া ভাবে উত্তর দিল, "এসে যাবে। তোর আমার স্টেশন তো একই।"

—"মানে?"

অব্বু, পেছন ফিরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কি এতটুকু বুঝিস না, তোর-আমার স্টেশন একই? অব্বু যখন তোকে দেখেছে তখনই এক হয়ে গিয়েছে। তোর জানের কসম, তোর গোলাম ঝুট বলছে না।"

মেয়েটি তার মাথার ওড়না টেনে দিল। ওর চোখই ওকে বলে দিচ্ছিল অব্বু কী বলতে চায় তা ও বুঝে ফেলেছে। আর তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল অব্বুর কথায় সে একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি। কিন্তু তার দ্বিধা ছিল দু'জনের স্টেশন এক হোক আর না হোক অব্বু তো সুন্দর। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হবে তো! স্টেশনে গিয়ে আর কি হবে, তার গাড়ি কখন চলে গিয়েছে কে জানে?

অব্বুর প্রশ্নে সে চমকে উঠল, "কি এতো ভাবছিস?"

ঘোড়া বেশ মেজাজে দুলকি চালে চলছিল। ভিজে-ভিজে একটা হাওয়া বইছিল। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলি ছুটে ছুটে চলে

যাচ্ছিল। আর তার ডালগুলি ঝুঁকে ছিল। ঘুঙুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। অব্বু ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির শ্যামবর্ণ সৌন্দর্যকে নিজের হৃদয়ে গেঁথে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সে জানালার একটি শিকের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে দিয়ে একলাফে পেছনের সিটে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসল। ও চুপচাপ বসে ছিল। অব্বু ওর হাত দুটি ধরে বলল, "দে, তোর লাগাম আমার হাতে দে।"

মেয়েটি শুধু বলল, "ছেড়ে দে"। কিন্তু তার আগেই সে অব্বুর বাহুপাশে আবদ্ধ হল। সে কোন আপত্তি করল না। নিশ্চয়ই সেই সময় তার হৃদয় খুব তোলপাড় চলছিল। যেন নিজেকে ছেড়ে তা উড়ে যেতে চাইছিল।

অব্বু ধীরে ধীরে তার ভালোবাসার কণ্ঠে তাকে বলতে লাগল, "এই টাঙ্গা এই ঘোড়া আমার জীবনের থেকেও প্রিয়। আমি একাদশ পীরের কসম খেয়ে বলছি, এই টাঙ্গা-ঘোড়া আমি বেচে তোর জন্যে সোনার বালা গড়ে দেব। নিজে ছেঁড়া-ফাঁটা কাপড় পরব, কিন্তু তোকে রাজকুমারী সাজিয়ে রাখব। ওয়াদহু লা-শরিকের কসম খেয়ে বলছি জীবনে এই আমার প্রথম প্রেম। তুই যদি আমার না হোস তবে তোর সামনেই আমার গলা কেটে ফেলব।"

তারপর সে মেয়েটিকে নিজের বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে দিল। বলল, "জানি না আমার কি হয়ে গিয়েছিল, চল, তোকে স্টেশনে ছেড়ে আসি।"

মেয়েটি ধীরে বলল, "না, তার আর হয় না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছ।"

অব্বুর মাথা ঝুঁকে গেল, "আমাকে মাফ করে দে—ভুল হয়ে গিয়েছে।"

—"ভুলটাকে কি শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারবে?"

মেয়েটির কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ ছিল। যেন কেউ অব্বুকে বলল, "এই টাঙ্গা থেকে এগিয়ে নিয়ে যাও নিজের টাঙ্গা।" অব্বুর হেঁট মাথা

সোজা হয়ে গেল। তার চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

অব্বু তার বলিষ্ঠ বুকের ওপর হাত রেখে বলল, "অব্বু তোর জন্যে নিজের জান দিয়ে দেবে।"

মেয়েটি তার হাত অব্বুর দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, "এই নে আমার হাত।"

অব্বু তার হাত দৃঢ়তার সঙ্গে চেপে ধরে বলল, "কসম আমার যৌবনকে, অব্বু তোর গোলাম।"

পরের দিন অব্বু আর সেই মেয়েটির নিকা হয়ে গেল। মেয়েটি গুজরাটের কোন এক জেলার মুচির মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল ইনায়ত বা নীতি। নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে ও এখানে এসেছিল। স্টেশনে ওরা যখন প্রতীক্ষা করছিল তখন অব্বুর সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হয়। আর সেই সাক্ষাৎই সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার প্রাসাদ গড়ে তুলল। অব্বু টাঙ্গা-ঘোড়া বেচে দিয়ে যদিও নীতির জন্যে কোন সোনার বালা গড়ে দেয়নি, কিন্তু তার জমানো টাকা দিয়ে সে তার জন্যে সোনার দুল কিনেছিল। রেশমের কয়েকটি জামা-কাপড়ও তৈরী করেছিল।

রেশমী জামা-কাপড় পড়ে সে যখন অব্বুর সামনে এসে দাঁড়াত তখন তার হৃদয় নেচে উঠত—"কসম পবিত্র পঞ্জতনের নামে, দুনিয়াতে আমার চেয়ে খুশীতে পাগল মানুষ আর দুটি নেই।" নীতিকে সে তার বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলত, "তুই আমার দিল কী রাণী।"

দু'জনেই যৌবনের পাগলপনায় ডুবে ছিল। গাইত হাসত ঘুরে বেড়াত আর দু'জন দু'জনের শুভ কামনা করত। এক মাস এমনি ভাবে কেটে গেল। কিন্তু একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে অব্বুকে গ্রেফতার করল। নীতিকেও ধরে নিয়ে গেল। অব্বুর ওপর অপহরণের মামলা চলল। নীতি একটুও টলল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অব্বুর দু'বৎসরের কারাদণ্ড হল। আদালত যখন এই

ফরমান দিল, তখন নীতি অব্বুকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে ও শুধু বলল, "আমি আমার মা-বাবার কাছে যাব না—ঘরে বসে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

অব্বু তার পিঠে চাটি মেরে বলল, "বেঁচে থাক, ··টাঙ্গা-ঘোড়া আমি দীনার জিম্মায় রেখে গেলাম···ভাড়া উশুল করে নিস।"

নীতির বাবা-মা ওকে অনেক বোঝাল, কিন্তু ও কিছুতেই তাদের সঙ্গে গেল না। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তারা হাল ছেড়ে দিল। নীতি একাই থাকতে লাগল। সন্ধ্যার সময় দীনা ওকে পাঁচ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছিল। এই পাঁচ টাকা ওর খরচ-খরচার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর তাছাড়া মোকদ্দমার জন্যে প্রতিদিন পাঁচ টাকা থেকে যা খরচ করে বাঁচত তাও ওর কাছেই ছিল।

সপ্তাহে একবার জেলখানায় নীতি আর অব্বুর দেখা-সাক্ষাৎ হত। আর এই সময়টুকু ছিল ওদের কাছে খুবই সংক্ষিপ্ত। নীতির কাছে যতটুকু জমা টাকা ছিল তা অব্বুর আরামের জন্যে খরচ হয়ে গেল। এক সাক্ষাতে অব্বু নীতির খালি কানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নীতি তোর কানের দুল কোথায় ?"

নীতি হেসে দিল। হেসে শাস্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে অব্বুকে বলল, "চুপ হয়ে গেলে কেন ?"

অব্বু বেশ কিছুটা রুষ্ট হয়ে বলল, "আমার কথা তোকে এত ভাবতে হবে না। যে ভাবেই থাকি না কেন, ভালোই আছি।"

নীতি কোন জবাব দিল না। সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই হাসতে হাসতে সে ওখান থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বাড়িতে এসে খুব কাঁদল। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল, কারণ অব্বুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবারের সাক্ষাতে অব্বুকে প্রায় চিনতেই পারছিল না। দোহারা-চেহারার অব্বু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। নীতির মনে হচ্ছিল অব্বুকে অব্বুর দুঃখ কুরে কুরে খাচ্ছে। তার বিচ্ছেদেই অব্বুকে এমন করে

দিয়েছে। কিন্তু সে জানত না অব্বুকে ক্ষয়রোগে ধরেছে। এ অসুখ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। অব্বুর' বাবা অব্বুর চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ক্ষয়রোগ তাকেও অল্পদিনের মধ্যে কবরে নিয়ে গিয়েছিল। অব্বুর বড় ভাইও সুন্দর জোয়ান ছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনে এই অসুখ তাকেও পিষে মারে। অব্বু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তাই জেলের হাসপাতালে সে যখন শেষ নিশ্বাস নিচ্ছিল, তখন দুঃখে সে বলল, "ওয়াদহু লা-শরীকের কসম খেয়ে বলছি, যদি জানতাম এত তাড়াতাড়ি মারা যাব তবে তোকে কখনও বিবি করতাম না······আমি তোর ওপর অনেক জুলুম করেছি···আমাকে মাফ করে দে···আর আমার এক নিশানা আছে —আমার টাঙ্গা-ঘোড়া···একটু নজর দিস···আর চুন্নী বেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলিস, অব্বু তোকে ভালোবাসা পাঠিয়েছে।"

অব্বু মারা গিয়েছিল—নীতিরও সব কিছু মারা গিয়েছিল। কিন্তু ও ছিল সাহসী মহিলা। এই দুঃখকে ও সহ্য করে নিয়েছিল। ঘরে একা একা পড়ে থাকত। সন্ধ্যার সময় দীনা আসত। এসে তাকে ভরসা দিয়ে বলত,"কোন কিছু ভেব না ভাবী, খোদার আগে কারও হাত নেই। অব্বু আমার ভাই ছিল·· আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, খোদার হুকুমে আমি তা করব।"

প্রথম প্রথম নীতি কিছুই বুঝতে পারত না। কিন্তু যখন শোকের দিন পুরো হল, তখন দীনা খোলাখুলি তাকে বিয়ে করতে বলল। দীনার কথা শুনেই নীতির মনে হল ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দেয়। দীনাকে শুধু সে বলল, "ভাই, আমি বিয়ে করব না।"

সেইদিন থেকে দীনার ব্যবহারও পালটে গেল। আগে প্রতি দিনই সন্ধ্যায় পাঁচ টাকা আদায় হত। এখন কোন দিন চার টাকা কোন দিন তিন টাকা করে দিতে লাগল। বাহানা দিতে লাগল খুব মন্দা চলছে। আবার কখনও কখনও দু-দু তিন-তিন দিন

বেপাত্তা হয়ে থাকতে লাগল। কখনও বলত অসুখ করেছে, কখনও বাহানা দিত গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে সেজন্যে ঘোড়া জুততে পারিনি। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারল, তখন সে দীনাকে বলল, "ভাই দীনা, তোমার আর হয়রান হওয়ার প্রয়োজন নেই। টাঙ্গা-ঘোড়া আমাকে জমা দিয়ে যাও।"

অনেক টালবাহানার পর মুখ কাচুমাচু করে সে টাঙ্গা এবং ঘোড়া নীতিকে ফেরত দিল। যাওয়ার সময় দীনা মাঝেকে দিয়ে গেল। মাঝে ছিল অব্বুর বন্ধু। সেও কয়েকদিন পরে নীতির কাছে বিয়ের প্রার্থনা করল। নীতি অস্বীকার করলে তার চোখের ভাষাও পাল্‌টে গেল। সহানুভূতিটুতি সব উবে গেল। তার কাছ থেকেও নীতি টাঙ্গা-ঘোড়া ফেরত নিয়ে নিল এবং এক অচেনা কোচোয়ানকে দিল।

এক সন্ধ্যায় সে যখন পয়সা দিতে এল তখন সে নেশায় বুঁদ ছিল। দরজায় পা দিয়েই সে নীতির গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করল। নীতি তাকে খুব একচোট নিল এবং কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল।

আট দশ দিন টাঙ্গা-ঘোড়া এমনিই আস্তাবলে পড়ে রইল। ঘাস এবং দানার খরচ ছাড়াও আস্তাবলের ভাড়া ছিল। নীতি এক অদ্ভুত চিন্তায় দিন কাটাছিল। কেউ বিয়ের প্রার্থনা করে, কেউ তার অসম্মতির ওপর হাত লাগানোর চেষ্টা করে, কেউ পয়সা মেরে দেয়। বাইরে বের হলে মানুষ খারাপ নজরে ঘুরে ঘুরে দেখে। এক রাতে তার এক প্রতিবেশী দেয়াল টপকে তার ঘরে এল এবং তার গায়ে হাত দিল। ভাবতে ভাবতে নীতির পাগল হয়ে যাবার উপক্রম, এখন সে কি করে!

একদিন বসে ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এল, আমি কেন নিজেই টাঙ্গা জুতি না—নিজেই চালাই। যখন সে অব্বুর সঙ্গে বেড়াতে বের হত তখন তো সে নিজেই টাঙ্গা চালাত। শহরের

রাস্তা-ঘাটও তো জানা। কিন্তু সে আবার ভাবল, লোকে কি বলবে? তার মন এবং চেতনাই তাকে উত্তর জোগাল—এতে কি আছে, মেয়েরা মেহনত করে রোজগার করে—কয়লার খনিতে কাজ করে, অফিসে-দপ্তরে কাজ করে, ঘরে বসেও কাজ করার মেয়েতো হাজার হাজার আছে। যেমন করেই হোক পেট চালাতে হবে।

কয়েকদিন ধরে নীতি চিন্তা-ভাবনা করল। শেষে সে ঠিক করল, টাঙ্গা সে নিজেই চালাবে। নিজের ওপর তার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল। সুতরাং খোদার নাম নিয়ে সে আস্তাবলে গেল। টাঙ্গা জুততে দেখে সমস্ত কোচোয়ানরা অবাক হয়ে রইল। কেউ মজার ব্যাপার ভেবে একচোট হাসল। যারা বয়স্ক ছিল তারা নীতিকে এ কাজ না করার জন্যে বোঝাল। এ ঠিক নয়। কিন্তু নীতি তাদের কথায় কান দিল না। টাঙ্গা ঠিক-ঠাক করে নিল। পিতলের তকমাগুলি পরিষ্কার করে ঝকমক করে তুলল। ঘোড়াকে খুব আদর করল। আর আব্বুর সঙ্গে মনে মনে ভালোবাসার কথা বলতে বলতে আস্তাবলের বাইরে বেরিয়ে এল। কোচোয়ানরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল টাঙ্গা চালনোর কৌশলে নীতির নিপুণ হাত দেখে।

শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল, এক সুন্দরী মেয়ে মানুষ টাঙ্গা চালাচ্ছে। সমস্ত জায়গায় শুধু এই একই আলোচনা চলছিল। লোক এই আলোচনা শুনছিল আর প্রতীক্ষা করছিল কখন এই রাস্তা দিয়ে ও টাঙ্গা ছুটিয়ে যাবে।

প্রথমে প্রথমে পুরুষ-সওয়ারিরা টাঙ্গায় উঠতে দ্বিধা করছিল, কিন্তু অল্প দিনেই সে-দ্বিধা দূর হয়ে গেল। এবং খুব রোজগার হতে লাগল। এক মিনিটের জন্যেও নীতির টাঙ্গা খালি থাকত না। এক সওয়ারি নামতে না নামতেই আর একজন উঠে বসত। কে তাকে প্রথম ডেকেছে তাই নিয়ে কখনও কখনও সওয়ারিদের

মধ্যে লড়াই পর্যন্ত হয়ে যেত।

কাজের চাপ যখন বেড়ে গেল তখন নীতি টাঙ্গা চালানোর সময় ঠিক করে নিল। সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত, এবং দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। এই সময়টুকুই তার নিজের কাছে সুখকর মনে হত। চুন্নীও খুশী ছিল। কিন্তু ও অনুভব করতে লাগল অধিকাংশ মানুষই তার নৈকট্যতার জন্যে টাঙ্গায় চড়ে। বিনা মতলবে, বিনা উদ্দেশ্যে ওকে এদিকে ওদিকে নিয়ে যেত। নিজেদের মধ্যে কুৎসিত ঠাট্টা তামাশা করত। শুধু ওকে শোনানোর জন্যেই এ সব কথা-বার্তা বলত। ওর মনে হতে লাগল ও নিজেকে না বেচলেও মানুষ চুপে চুপে ওকে কেনা-কাটি করছে। তাছাড়া ও জানত শহরের সমস্ত কোচোয়ানরা ওকে ভালো চোখে দেখছে না। এসব জানা সত্ত্বেও ও এতটুকু উৎকণ্ঠ ছিল না। নিজের আত্ম-বিশ্বাসের জন্যে ও সন্তুষ্ট ছিল।

একদিন মিউনিসিপ্যাল কমিটি নীতিকে ডেকে পাঠাল এবং তার লাইসেন্স কেড়ে নিল। কারণ হিসেবে বলল, "মেয়ে মানুষ টাঙ্গা চালাতে পারে না।" নীতি জিজ্ঞেস করল, "জনাব, মেয়ে মানুষ টাঙ্গা কেন চালাতে পারবে না ?"

কমিটি জবাব দিল,"ব্যাস, চালাতে পারে না, তোমার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হল।"

নীতি বলল, "হুজুর,আপনি টাঙ্গা-ঘোড়াও বাজেয়াপ্ত করে নিন। কিন্তু আমাকে অন্তত এইটুকু বুলুন, "মেয়ে মানুষ কেন টাঙ্গা জুততে পারবে না ? মেয়েরা চরকা চালিয়ে পেট চালাতে পারে, টুকরি বয়ে রোজগার করতে পারে ; লাইনের ওপর কয়লা কুড়িয়ে নিজের পেটের জন্যে খাবার সংগ্রহ করতে পারে, তবে আমি কেন টাঙ্গা চালাতে পারব না ? আমি আর কোন কাজ জানি না। টাঙ্গা-ঘোড়া আমার স্বামীর। কেন আমি তা চালাতে পারব না ? হুজুর, আপনি দয়া করুন। মেহনত-মজদুরি আপনি কেন বন্ধ করে

দিচ্ছেন? আমি কি করব? আমাকে বলে দিন।"

অফিসার বলল, "যাও, বাজারে গিয়ে বস। ঐখানে ভালো কামাই হবে।"

অফিসারের কথা শুনে নীতির ভেতর যে আসল নীতি ছিল তা জ্বলে ছাই হয়ে গেল। খুব ধীরে 'আচ্ছা জী' বলে ও বেরিয়ে এল। জলের দামে টাঙ্গা-ঘোড়া বিক্রি করে দিয়ে ও সোজা অব্বুর কবরের কাছে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল—যেমন বর্ষার পর প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ খেতের নরম ভাবকে শুকিয়ে দেয়। ওর বন্ধ ঠোঁট খুলে গেল। কবরকে সম্বোধন করে বলল, "অব্ব, তোর নীতি আজ কমিটির দপ্তরে মারা গিয়েছে।"

শুধু এই কথাটুকু বলে ও চলে এল। পরের দিন ও আর্জি পেশ করল। নিজের দেহ বেচার লাইসেন্স ও পেয়ে গেল।

কালো শালোয়ার

দিল্লী আসার আগে ও আম্বালা ছাউনিতে থাকত, সেখানে কয়েকজন গোরা ওর খদ্দের ছিল। এই গোরাদের সঙ্গে মেলা-মেশার জন্যে ও দশ-পনেরোটা ইংরেজী শব্দ শিখে গিয়েছিল। ওদের কাছ থেকে শেখা এইসব শব্দ ও অবশ্য সব সময় ব্যবহার করত না। কিন্তু দিল্লী এসে ওর কারবার যখন মন্দা হল, তখন ও ওর প্রতিবেশী তমনচা জানকে বলল, "দিস লাইফ ভেরি ব্যাড। —এই জীবন এত কষ্টকর যে একটু খাবারও জোগাড় হয় না।"

আম্বালা ছাউনিতে ওর ধান্ধা খুব ভালোভাবে চলত। ছাউনির গোরারা মদ খেয়ে ওর কাছে আসত। আর ও তিন চার ঘণ্টার মধ্যে আট দশটি গোরার সঙ্গে কাজ-কারবার পুরো করে বিশ ত্রিশ টাকা রোজগার করে নিত। এই গোরারা ওর দেশের লোককে মোকাবিলা করার জন্যে খুব জবরদস্ত ছিল। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, এই গোরারা যে ভাষায় কথা বলত তা সুলতানা বুঝতে পারত না, বরং এই ভাষা না জেনে সুলতানা ভালোই করেছিল। যদি তারা ওর কাছে কিছু জানতে চাইত তবে ও মাথা কাত করে বলত, "সাহেব, তোমাদের কথা আমি বুঝি না।" আর তারা যদি বেশী জবরদস্তি করত তবে ও নিজের ভাষায় তাদের গালি-গালাজ দিত। তারা যদি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত তবে ও বলত, "সাহেব, তোমরা একেবারে উল্লু কা পট্‌ঠা। হারামজাদা—বুঝেছ?" যখন সাহেবদের এইভাবে গালিগালাজ করত তখন ওর কণ্ঠে কোন তেজ থাকত না, বরং ভালোবাসায় গদগদ হয়ে বলত। ওরা যখন হাসত তখন ওদের মুখ দেখে সুলতানার মনে হত যেন

বিলকুল উল্লু কে পট্‌ঠে।

কিন্তু এখানে,দিল্লীতে ও যতদিন হয় এসেছে তাঁর মধ্যে একদিনও কোন গোরা ওর কাছে আসেনি। তিন মাস ধরে ও হিন্দুস্থানের এই শহরে আছে, শুনেছে এই শহরে বড় লাট সাহেব থাকেন—যিনি গরমের সময় সিমলাতে যান। এই তিন মাসে মাত্র ছ'জন মানুষ ওর কাছে এসেছে। মাত্র ছ'জন অর্থাৎ মাসে দু'জন। আর এই ছ'জন খদ্দেরের কাছ থেকে খোদার নামে শপথ করে বলা যায় ও মাত্র সাড়ে আঠেরো টাকা কামিয়েছে। তিন টাকার চেয়ে বেশী কেউ দিতেই চায় না। এই ছ'জনের মধ্যে পাঁচ জনের কাছে সুলতানা তার রেট দশ টাকা বলেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তারা প্রত্যেকেই বলেছিল, তিন টাকার বেশী এক কানা কড়িও দেব না। জানি না কেন তারা প্রত্যেকেই ওকে তিন টাকার সামগ্রী ভাবল। তাই ষষ্ঠ খদ্দের যখন এল তখন ও নিজেই তাকে বলল, দেখ, "আমি পুরো তিন টাকা নেব। এর এক-আধলা কম বললে হবে না। তোমার মর্জি হয়তো থাক, নয় চলে যাও।" ষষ্ঠ খদ্দেরটি ওর এই জবাব শুনে কোন দর-দাম না করে থেকে গেল। অন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে যখন নিজের কোট খুলতে লাগল তখন সুলতানা তাকে বলল, "দুধের জন্যে একটা টাকা দাও দেখি।"

পুরো একটাকা সে সুলতানাকে দিল না, নতুন রাজার একটা চকচকে আধুলি পকেট থেকে বের করে দিল। আর সুলতানাও চটপট সেই আধুলিটা নিয়ে নিল, যা পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট।

তিন মাসে সাড়ে আঠেরো টাকা। মাসে বিশ টাকা তো এই বাড়িরই ভাড়া—যাকে বাড়ির মালিকরা ইংরেজীতে 'ফ্ল্যাট' বলে। এই ফ্ল্যাটে এমন স্যানেটারি ব্যবস্থা ছিল যে, লোহার শিকল ধরে টানলেই সমস্ত নোংরা জলের তোড়ে একেবারে নীচের নর্দমায় হাওয়া

হয়ে যেত এবং খুব শব্দ হত। প্রথম প্রথম এই শব্দে ও খুব ভয় পেয়ে যেত। প্রথম দিন ও যখন পায়খানায় গেল সেদিন ওর কোমরে একটা টনটনে ব্যথা হচ্ছিল। কাজ সেরে উঠতে গিয়ে ও এই শিকল ধরে নিজেকে কোন মতে সামলিয়ে নেয়। এই শিকল দেখে ও ভেবে ছিল, তাদের যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্যেই হয়তো এই বাড়িতে শিকল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কারো কোন অসুবিধা হলে যাতে এই শিকলের সাহায্য নিতে পারে। কিন্তু যেই ও শিকল ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, তখন ওপরে খট করে একটি আওয়াজ হল। আর জল এমন তোরে শব্দ করে বের হল যে ভয়ে ও চীৎকার করে উঠল।

খোদাবক্স তখন অন্য একটা ঘরে নিজের ফটোগ্রাফির জিনিস পত্র গোছ-গাছ করছিল এবং পরিষ্কার একটি বোতলে হাইড্রো-ক্লোরাইন ঢালছিল। সুলতানার চীৎকার শুনে সে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সুলতানাকে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার, কি হয়েছে। তুমিই কি চীৎকার করেছিলে?"

সুলতানার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। ও বলল, "পায়খানায় এটা কি! মাঝখানে রেলগাড়ির মতো এটা কি ঝুলিয়ে রেখেছে। আমার কোমরে ব্যথা। ভাবলাম, এটা ধরে দাঁড়াই। যেই না আমি শিকল ধরে টানলাম ওমনি তা এমন শব্দ করে উঠল যে তোমাকে আমি কি বলব।"

শুনে খোদাবক্স একচোট হাসল। তারপর সে এই স্যানেটারি সম্পর্কে সুলতানাকে সব বুঝিয়ে দিল। বলল, "এ এক নতুন ফ্যাশান, শিকল ধরে টানলেই সমস্ত নোংরা নীচে নেমে যায়।"

খোদাবক্স আর সুলতানার মধ্যে আপনা থেকেই কিভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। খোদাবক্স এক সময় রাওলপিণ্ডিতে থাকত। এণ্ট্রেন্স পাশ করার পর সে লরি চালানো শেখে, আর চার বছর ধরে সে রাওলপিণ্ডি থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত লরি

চালানোর কাজ করত। সেই সময় কাশ্মীরে এক মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়। সেখান থেকে সে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে আসে। লাহোরে সে কোন কাজ জোগার করতে না পারায় মেয়েটিকে সে পেশায় লাগিয়ে দেয়। দু-তিন বছর এই ভাবেই চলে, কিন্তু একদিন সেই মেয়েটি অন্য একজনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। খোদাবক্স জানতে পারল সে আম্বালায় আছে। সে তার খোঁজে সেখানে আসে এবং সুলতানাকে পেয়ে যায়। সুলতানাও তাকে পছন্দ করে,পরে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

খোদাবক্স সেখানে আসতেই সুলতানার কারবার হু হু করে বেড়ে ওঠে। মেয়ে মানুষরা সাধারনত অন্ধ বিশ্বাসী, তাই সুলতানা ভাবল খোদাবক্স ভগবান। কারণ সে আসাতেই ওর বাজার এত রমরমা হয়েছে। এই বিশ্বাসের জন্যে খোদাবক্সের মর্যাদা ওর কাছে আরও বেড়ে গেল।

খোদাবক্স ছিল পরিশ্রমী মানুষ। সারা দিন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকা সে মোটেই পছন্দ করত না। একজন ফটো-গ্রাফারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে বক্স-ক্যামেরা দিয়ে সে ফটো তুলতো। তার কাছ থেকেই খোদাবক্স ফটো তোলার কাজ শিখে নিল, এবং সুলতানার কাছ থেকে ষাট টাকা নিয়ে একটা ক্যামেরাও কিনে ফেলল। ধীরে ধীরে একটা পর্দা তৈরী করাল, দুটো চেয়ার কিনল এবং ফটো ধোয়ার সমস্ত সরঞ্জাম কিনে সে নিজেই কারবার খুলে বসল।

কারবার ভালোই চলছিল। খুব অল্প দিনের মধ্যেই আম্বালা ছাউনিতে সে জাঁকিয়ে বসল। এখানে সে গোরাদের ফটো তুলত। এক মাসের মধ্যেই ছাউনির অনেক গোরার সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। এবং পরে সুলতানাকে সে তাদের কাছে নিয়ে গেল। খোদাবক্সের মাধ্যমে ছাউনির অনেক গোরাই সুলতানার খদ্দের হয়ে গেল।

সুলতানা কানের ছুল কিনল। সাড়ে পাঁচ তোলার আটটি কঙ্কনও তৈরী করাল। দশ-পনেরোটা দামী দামী শাড়িও কিনল। ঘরে ফার্নিচার ও অন্যান্য জিনিসও এল। অর্থাৎ এই আম্বালা ছাউনিতে বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ খোদাবক্সের মনে কি হল তা কে জানে, সে দিল্লী চলে আসা ঠিক করল। সুলতানা খোদাবক্সকে কিভাবে না করে, কারণ খোদাবক্সকে ও নিজের সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করে। ও হাসিমুখেই দিল্লী যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নিল। ও ভেবেছিল এত বড় শহর যেখানে লাট সাহেব থাকেন সেখানে ওর ধান্দা আরও ভালোভাবে চলবে। নিজে দিল্লীর অনেক প্রশংসা শুনেছিল। তাছাড়া সেখানে হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার আছে। এই মাজার সম্পর্কে ওর মনে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। দেরী না করে ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র বিক্রি করে খোদাবক্সের সঙ্গে ও দিল্লী চলে এল। এখানে এসে খোদাবক্স বিশ টাকায় এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিল এবং দু'জনে একসঙ্গে থাকতে লাগল।

একই রকম দেখতে নতুন বাড়িগুলো রাস্তার পাশ দিয়ে এক কাতারে বহুদূর চলে গিয়েছিল। মিউনিসিপ্যাল কমিটি শহরের এই অংশ বেশ্যাদের জন্যেই বানিয়ে দিয়েছিল। যাতে এরা শহরের যেখানে-সেখানে ঘাঁটি গেড়ে না বসে। নীচে দোকান আর ওপরে এই ফ্ল্যাট। সমস্ত দালানগুলি একই ডিজাইনে তৈরী হয়েছিল বলে মাঝে মাঝে নিজের ফ্ল্যাট খুঁজে বের করতে ওকে অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু লণ্ড্রিওয়ালা যখন তার দোকানে সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দিল তখন ওর নিশানা ঠিক হয়ে গেল।

'এখানে ময়লা কাপড় ধোলাই করা হয়'—বোর্ডের এই লেখা পড়েই ও নিজের ফ্ল্যাট চিনে নিতে পারত। এই রকম আরও অনেক নিশানা ও ঠিক করে নিয়েছিল। যেখানে বড় বড় হরফে 'কয়লার দোকান' লেখা সেখানে ওর বান্ধবী হীরা বাই থাকত, যে

মাঝে মাঝে রেডিওতে গান গাইতে যেত। যেখানে 'ভদ্রলোকদের জন্যে নানারকম খাবার পাওয়া যায়' লেখা আছে সেখানে ওর আর এক বান্ধবী মুখতার থাকত। নেওয়ারের কারখানার ওপরে অনবরী থাকত। সে ঐ কারখানার সেঠের কাছে চাকরী করত। রাত্রেও সেঠকে কারখানা দেখা-শোনা করত হত বলে সে অনবরীর কাছেই থেকে যেত।

কারবার চালু হওয়ার পর সাধারণত খুব অল্প খরিদ্দারই আসে। কিন্তু যখন এক মাস সুলতানা বেকার থাকল তখন ও নিজের মনকে বোঝাল। কিন্তু দু'মাস চলে যাওয়ার পরও যখন কোন মানুষ তার ঘরে এল না তখন ও খুব চিন্তায় পড়ে গেল। ও খোদাবক্সকে বলল, "খোদাবক্স পুরো দু'মাস হয়ে গেল আমি এখানে এসেছি, এর মধ্যে কেউ আমার ঘরে এল না। জানি, আজকাল বাজার খুব মন্দা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মাস ভর কারো মুখ দেখব না।"

খোদাবক্সের নিজেরই এ ব্যাপারে খটকা ঠেকছিল, কিন্তু সে চুপ করেছিল। সুলতানা যখন নিজে থেকে কথা তুলল তখন সে বলল, "আমিও ক'দিন থেকে এই কথাই ভাবছি। একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে, যুদ্ধের জন্যে লোক-জন বিভিন্ন চক্করে পড়ে এই রাস্তা ভুলে গিয়েছে। কিম্বা এও হতে পারে······" সে কথা শেষ করার আগেই সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। খোদাবক্স এবং সুলতানা —দু'জন সিঁড়ির সেই আওয়াজের দিকে তাকাল।

দরজায় কেউ একজন শব্দ করল। খোদাবক্স লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। একজন লোক ভেতরে ঢুকল। এ ছিল প্রথম খদ্দের, যে তিন টাকায় রফা করল। এর পর আরও পাঁচজন আসে, অর্থাৎ তিন মাসে ছ'জন, যাদের কাছ থেকে সুলতানা মাত্র সাড়ে আঠারো টাকা উশুল করে।

বিশ টাকা তো ওই ফ্ল্যাটেরই ভাড়া। তাছাড়া জলের ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, ওষুধ-টষুধের খরচ

তো পৃথক। অথচ কোন আমদানী নেই। তিন মাসে সাড়ে আঠারো টাকাকে কোন আমদানী বলা যায় না। সুলতানা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। সাড়ে পাঁচ তোলার যে আটটি কঙ্কন ও আম্বালায় বানিয়ে ছিল তা এক এক করে বিক্রি করে দিল। শেষ কঙ্কনটি যখন বিক্রি করার সময় এল তখন ও খোদাবক্সকে বলল, "তুমি আমার কথা শোন, চল আম্বালায় ফিরে যাই"। এখানে কি আছে? ...তোমার হয়তো ভালো লাগছে, কিন্তু এই শহর থেকে আমার মন উঠে গেছে। তোমার কাজ-কারবারও তো আম্বালাতে ভালো চলত। চল, সেখানেই ফিরে যাই। যা ক্ষতি হয়েছে তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। যাও এই কঙ্কনটা বেচে এস। আমি জিনিস-পত্র বেঁধে-টেঁধে তৈরী থাকছি। আজকে রাতের গাড়িতে এখান থেকে রওনা হব।"

খোদাবক্স সুলতানার হাত থেকে কঙ্কনটা নিয়ে বলল, "আম্বালায় ফিরে যাওয়ার আর ইচ্ছে নেই। এই দিল্লীতে থেকেই কামাব। তোমার এই চুড়ি এক এক করে আবার ফিরিয়ে আনব। আল্লার ওপর ভরসা রাখ। এ আল্লার কারসাজি। এখানেও তিনি একদিন কোন না কোন পথ বাতলিয়ে দেবেন।"

কিন্তু যখন পাঁচ পাঁচটি মাস চলে গেল এবং খরচের তুলনায় আমদানী এক চতুর্থাংশেরও কম হতে লাগল তখন সুলতানা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। খোদাবক্সও এখন প্রায়ই সারা দিন কোথাও উধাও হয়ে থাকতে লাগল। সে'জন্যেও সুলতানার মনে দুঃখ ছিল। অবশ্য আশ-পাশে মেলা-মেশা করার মতো দু-একজনের সঙ্গে যে ওর পরিচয় ছিল না তা নয়, যাদের সঙ্গে ও কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন তাদের ওখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্পগুজব করা ওর কাছে ভালো লাগত না। আস্তে আস্তে ও ওর এই বান্ধবীদের সঙ্গেও মেলা-মেশা বন্ধ করে দিল। সারা দিন ও ওর নিজের ফাঁকা ঘরেই চুপচাপ বসে থাকত। কখনও ও সুপুরি কাটত, কখনও পুরনো আর ছেঁড়া-ফাটা জামা-কাপড়

সেলাই করত। কখনও বাইরের ব্যালকনিতে এসে জানালার সঙ্গে ঠেস দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সামনের রেলওয়ে শেডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বা চলন্ত ইঞ্জিনের দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ও তাকিয়ে থাকত।

রাস্তার অন্য দিকে ছিল মাল-গুদাম, যে মাল-গুদাম এক দিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ডান দিকে টিনের শেডের নীচে বড় বড় গাঁট পড়ে থাকত, আর চারদিকে নানা রকমের জিনিস-পত্রে স্তূপাকার। বাঁয়ে খোলা মাঠ, যে খোলা মাঠে অসংখ্য লাইন বিছানো। রৌদ্রে লোহার এই লাইনগুলো যখন ঝকমক করে উঠত তখন সুলতানা নিজের হাতের দিকে তাকাত। ওর হাতের নীল নীল শিরাগুলোও ঐ লাইনের মতোই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এই দীর্ঘ আর খোলা মাঠে সব সময় ইঞ্জিন আর গাড়ি চলাচল করত। কখনও এ দিকে যাচ্ছে, কখনও ওদিকে। ইঞ্জিন আর গাড়ির ঝিকঝিক আওয়াজ সব সময়ে লেগেই থাকত। খুব ভোরে ও যখন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াত তখন এই দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখাত। কুয়াশার মধ্যে যখন ইঞ্জিনের মুখ দিয়ে ঘন ধোঁয়া বের হয়ে অপরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে উঠত তখন মনে হত যেন মোটা সোটা আর নাদুস-নুদুস মানুষগুলো এক এক করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। বাষ্পের বড় বড় জলবিন্দুগুলিও রেল-লাইন থেকে আওয়াজ করে বের হয়ে আসত এবং চোখ মিটমিট করতে করতে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। যখন গাড়ির কামড়াগুলোকে এক ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিত তখন ওর নিজের কথা খুব বেশী করে মনে পড়ে যেত। ওর মনে হত কেউ ওর জীবনের লাইনে এক ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আর ও আপনা-আপনি সেই লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য সবাই লাইন বদল করছে, আর ও ছুটেই চলেছে—না জানি কোন্ দিকে চলেছে! এমন একদিন আসবে যখন এই ধাক্কার জোর আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে আর ও কোথাও এসে একেবারে থেমে যাবে।

এমন এক জায়গায় থেমে যাবে যেখানে ওর দেখাশোনা করার কেউ থাকবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেলের এই এঁকে-বেঁকে যাওয়া লাইন, আর দাঁড়িয়ে থাকা বা চলন্ত ইঞ্জিনের দিকে ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকিয়ে থাকত। আর একটার পর একটা কল্পনা ওর মনে খেলে যেত। যখন ও আম্বালা ছাউনিতে থাকত তখন ওর ঘর ষ্টেশনের খুব কাছেই ছিল। কিন্তু যেখানে ও কোন দিন এইসব দৃশ্যগুলোকে এভাবে দেখার চেষ্টা করেনি। কখনও কখনও ওর মনে হত সামনে জালের মতে বিছানো এই রেল-লাইন এবং মাঝে মাঝে যে বাষ্প আর ধোঁয়া উঠছে তা যেন এক বিরাট বেশ্যাখানা। সেখানে অসংখ্য গাড়ি ছিল আর তার মাঝে বেশ কিছু বড় সর ভারি ইঞ্জিন এদিক থেকে ওদিক টহল দিচ্ছিল। এই ইঞ্জিনগুলোকে দেখলে সুলতানার সেঠজী বলে মনে হত, যারা আম্বালাতে কখনও কখনও ওর ঘরে যাতায়াত করত। আবার যখন কোন ইঞ্জিন ধীরে ধীরে সার সার গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যেত, তখন ওর মনে হত কেউ যেন বেশ্যাপট্টির মাঝ দিয়ে ওপরের ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে।

সুলতানা জানত এই ধরণের উদ্ভট চিন্তা মাথার গণ্ডগোল থেকেই হয়। যখন প্রায় সব সময়েই ওর এই ধরণের উদ্ভট কল্পনা হতে লাগল, তখন ও ব্যালকনিতে যাওয়া ছেড়ে দিল। খোদাবক্সকে ও বারবার বলল, "দেখো, আমার অবস্থাটা একটু বিবেচনা কর। তুমি দু'দণ্ড ঘরে থাক। আমি সারাদিন অসুস্থের মতো পড়ে থাকি।" কিন্তু খোদাবক্স সব সময়েই ওকে আশ্বাস দিয়ে বলত, আমার জান, আমি বাইরে কিছু কামানের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লা রহম করলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমি এই বাধা পার হয়ে যাব।

পাঁচ মাস হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে না সুলতানা না খোদাবক্স কেউ বাধা পার হতে পারেনি।

মহরমের মাস এগিয়ে আসছিল। মহরমের সময় যে কালো কাপড় পরতে হয় তা সুলতানার কাছে ছিল না। মুখতার লেডি হেমিল্টনের এক নতুন কাটের কামিজ বানিয়ে ছিল, সেই কামিজের হাতা ছিল কালো জর্জেটের। এই কামিজের সঙ্গে ম্যাচ করার জন্যে তার কাছে কালো সাটিনের শালোয়ার ছিল। সেই শালোয়ারের রঙ ছিল কাজলের মতো চমকদার। অনবরীও রেশমী জর্জেটের একটি সুন্দর শাড়ি কিনে ছিল। সে সুলতানাকে বলে, এই শাড়ির নীচে সে সাদা বোস্কির পেটিকোট পরবে, কারণ এটাই নতুন ফ্যাশান। এই শাড়ির সঙ্গে পরার জন্যে অনবরী কালো মখমলের একজোড়া নরম জুতো কিনেছিল। এইসব জিনিস দেখে সুলতানার খুব দুঃখ হল, কারণ মহরম পালনের জন্যে এ সব কেনার কোন সামর্থ ওর ছিল না।

অনবরী এবং মুখতারের কাছে নতুন পোষাক দেখে ও যখন ঘরে ফিরে এল তখন ওর মন খুব উদাস হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল একটা ফোড়ার মতো কিছু ওর নিজের ভেতরে হয়েছে। ওর ঘর একেবারে খালি ছিল। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও খোদাবক্স বাইরে ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ও শতরঞ্জির ওপর পাশ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকল। কিন্তু যখন ওর ঘাড় ধরে গেল তখন ও ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াল এই দুঃখময় কল্পনাকে নিজের মন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে।

সামনে রেল-লাইনের ওপর বগিগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কোন ইঞ্জিন ছিল না। তখন সন্ধ্যার সময়। রাস্তার ওপর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে ধূলো বসে গিয়েছিল। বাজারে লোকজনের চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল, আর যারা এদিক-সেদিক উঁকিঝুকি মারছিল তারা চুপচাপ কোন ঘরে ঢুকে পড়ছিল। ঠিক এই ধরণের একজন লোক ঘার উঁচু করে সুলতানার দিকে তাকাল। সুলতানা মুচকি হেসে দিল। সে মুহূর্তের জন্যে খোদাবক্সের

কথা ভুলে গেল, কারণ রেল-লাইনের ওপর একটা ইঞ্জিন এসে গিয়েছিল। সুলতানা ওকে খুব ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে ওর মনে হতে লাগল ইঞ্জিনও কালো পোশাক পড়ে রয়েছে। এই অদ্ভুত ধরণের দুঃখের চিন্তা ও মন থেকে হটানোর জন্যে যখন রাস্তার দিকে তাকাল তখন দেখল সেই লোকটি গরু-গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে, যে এই কিছুক্ষণ আগে ওকে কামাতুর চোখে দেখেছিল। সুলতানা তাকে হাত নাড়িয়ে ইশারা করল। লোকটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "কোন দিক্ দিয়ে আসব?" সুলতানা তাকে ওপরে ওঠার রাস্তা দেখিয়ে দিল। লোকটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফুর্তিবাজের মতো ওপরে উঠে এল।

সুলতানা তাকে শতরঞ্জির ওপর বসাল এবং গল্প শুরু করার জন্যে বলল, "ওপরে আসতে এত ভয় পচ্ছিলেন কেন?"

সুলতানার কথা শুনে লোকটি এক ঝলক মিষ্টি হাসল। হেসে বলল, "তুমি কিভাবে বুঝলে! ···ভয়ের কি আছে?"

সুলতানা তাকে বলল, "বললাম তার কারণ, আপনি অনেকক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর কিছু চিন্তা করছিলেন।"

সুলতানার কথা শুনে সে আবার হাসল,"তুমি ভুল বুঝেছ, আমি তোমার ওপরের ফ্লাটের দিকে দেখছিলাম। ঐখানে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে একজন লোককে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছিল। এই দৃশ্য আমার বেশ ভালোই লাগছিল। এর মধ্যে সবুজ বাল্ব জ্বলে উঠল তাই আমি একটু দাঁড়িয়ে গেলাম। সবুজ আলো আমি খুব ভালোবাসি। দেখতে খুব ভালো লাগে।" বলে ঘরের চারদিকে একবার সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তাকে উঠতে দেখে সুলতানা বলল,"কি,আপনি চলে যাচ্ছেন?"

লোকটি বলল,"না, তোমাদের এই ঘরগুলো দেখতে চাই, চলো ঘুরিয়ে সব ঘর দেখাও।"

সুলতানা তাকে তিনটি ঘর এক এক করে ঘুরিয়ে দেখাল। লোকটি মুখ বুজে ঘরগুলি দেখল। তারা দু'জনে আবার আগের ঘরে যেখানে সেই লোকটি বসে ছিল সেখানে ফিরে এল। এসে লোকটি বলল, "আমার নাম শঙ্কর।"

এই প্রথম সুলতানা শঙ্করকে খুঁটিয়ে দেখল। মাঝারি উচ্চতা। খুবই সাধারণ চেহারা, কিন্তু ওর চোখ দুটি ছিল অসাধারণ স্বচ্ছ আর সুন্দর। আর সেই চোখে কি ধরণের যেন এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ছিল। ব্যায়াম করা শক্ত সামর্থ দেহ। কানের কাছে কয়েক গোছা চুলে পাক ধরেছিল। ধূসর রঙের একটা প্যান্ট পরে ছিল। গায়ে যে সাদা সার্ট ছিল তার কলার ছিল ঘাড়ের ওপর ওঠানো।

শঙ্কর শতরঞ্জির ওপর এমন গ্যাট হয়ে বসে ছিল, যেন শঙ্কর নয় সুলতানা নিজেই তার খদ্দের। এই অনুভব সুলতানাকে বিচলিত করে তুলল। তাই সে শঙ্করকে বলল, "আদেশ করুন।"

শঙ্কর বসেই রইল। সুলতানার কথা শুনে, সে শুয়ে পড়ে বলল, "আমি কি আদেশ করব, তুমিই কর। তুমিই তো আমাকে ডেকেছ।"

সুলতানা ওর কথার কোন জবাব না দেওয়াতে সে উঠে বসল। আমি ভেবেছিলাম, "যাক তুমিই শোন। তুমি যা ভেবেছ তা ভুল। আমি সেইসব লোকদের একজন নই যারা কিছু দিয়ে যায়। ডাক্তারের মতো আমারও ফিস আছে। আমাকে ডাকলে ফিস দিতেই হবে।"

তার কথা শুনে সুলতানার মাথা ঘুরে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অনায়াসে হেসে উঠল, "আপনি কি কাজ করেন?"

শঙ্কর জবাব দিল, "তোমরা যে কাজ কর সেই কাজ।"

—"কি?"

—"তুমি কি কর?"

—"আমি কিছুই করি না।"

—"আমিও কিছু করি না।"

সুলতানা রেগে বলল, "এটা তো ঠিক নয়……আপনি কোন না কোন কাজ নিশ্চই করেন।"

শঙ্কর খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, "তুমিও নিশ্চই কিছু না কিছু কর।"

—"কিছুই করি না।'

—"আমিও কিছু করি না।"

—"তবে এস, দু'জনে কিছু করি।"

সুলতানা রেগে বলল, "এটা তো ঠিক নয়……আপনি কোন না কোন কাজ নিশ্চই করেন।

শঙ্কর খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, "তুমিও নিশ্চই কিছু না কিছু কর।"

—"কিছুই করি না।"

—"আমিও কিছু করি না।"

—"তবে এস, দু'জনে কিছু করি।"

তৈরী আছি, কিন্তু কিছু করার জন্যে আমি কখনও পয়সা দিই না।"

"নিজের বুদ্ধিকে একটু চিকিৎসা কর……এটা লঙ্গর খানা নয়।"

—"আমিও ভলেন্টিয়ার নই।"

সুলতানা আর কথা না বাড়িয়ে থেমে গেল। ও জিজ্ঞেস করল, "ভলেন্টিয়ার কি!"

শঙ্কর বলল, "উল্লু কে পট্‌ঠে।"

—"আমি উল্লু কী পট্‌ঠি নই।

—"তুমি না হতে পার, কিন্তু তোমার সঙ্গে যে থাকে সেই খোদাবক্স উল্লু কা পট্‌ঠা।"

—"কেন?"

—"কেন ? ও বেশ কিছুদিন ধরে এমন এক ফকিরের কাছে ওর ভাগ্য ফেরানের জন্যে যাতায়াত করছে যার নিজের ভাগ্যই জং ধরা তালার মতো বন্ধ।" বলে শঙ্কর হেসে উঠল।

সুলতানা শঙ্করের কথা শুনে বলল; তুমি হিন্দু, তাই আমাদের এই ফকিরকে নিয়ে ঠাট্টা করছ।

শঙ্কর বলল, "বেশ্যাখানায় হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ওঠানো উচিত নয়। বড় বড় পণ্ডিত এবং মৌলভীরাও এখানে এসে ভদ্রলোক বনে যায়।"

—"কি উটপটাং কথা বলছ, থাকবে কিনা বল ?"

—"থাকব, ঐ শর্তে,যা তোমাকে আগে বলেছি।"

সুলতানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "যাও, নিজের রাস্তা ধর।"

শঙ্কর হেলে দুলে উঠে দাঁড়াল। প্যাণ্টের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে যেতে যেতে বলল,"আমিও মাঝে মাঝে এই বাজার দিয়ে যাতায়াত করি। তোমার যদি কখনও কোন দরকার হয়, তবে ডাকবে··· আমি খুব কাজের লোক।"

শঙ্কর চলে গেল। সুলতানা কালো পোশাকের কথা ভুলে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শুধু ওর কথাই ভাবতে লাগল। এই মানুষটির কথাবার্তা তার দুঃখকে অনেকখানি হাল্কা করে দিয়েছিল। যদি সে আম্বালায় আসত, যেখানে ও সুখে ছিল, সেখানে সুলতানা তাকে অন্য চোখে দেখত এবং খুব সম্ভবত তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। কিন্তু এখানে ও উদাস হয়ে দিন কাটায়, তাই শঙ্করের কথা ওর খুব ভালো লাগল।

সন্ধ্যার সময় যখন খোদাবক্স এল তখন সুলতানা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আজ সারা দিন কোথায় উধাও হয়ে ছিলে ?"

খোদাবক্স ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। বলল, "পুরনো কেল্লা থেকে আসছি। সেখানে একজন ফকির কিছুদিন হল এসে রয়েছেন তার কাছেই প্রতিদিন যাই যাতে আমাদের দিন ফেরে।"

—"সে তোমাকে কিছু বলেছে ?"

—"না, এখনও সে মেহেরবান হয়নি। সুলতানা, আমি যেভাবে তার খিদমত করছি, তা কখনও বৃথা যাবে না। আল্লার যদি কৃপা থাকে তবে নিশ্চই দিন ফিরবে।"

সুলতানার মহরম পালনের কথা মনে পড়ে গেল। খোদাবক্সকে ও অশ্রু-ভরা সিক্ত কণ্ঠে বলল, "সারাদিন তুমি বাইরে বাইরে থাক। আর আমি এখানে খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকি। না কোথাও যেতে পারি, না আসতে পারি। মহরম মাথার ওপর এসে গিয়েছে। তুমি এর কোন ব্যবস্থা কর। কালকে আমার কাপড় চাই। ঘরে এক কানা কড়িও নেই। কঙ্কনগুলি ছিল, তাও এক এক করে গিয়েছে। তুমিই বল কি হবে ? ……ফকিরের পিছে আর কতদিন ঘুরে বেড়াবে। আমার মনে হচ্ছে দিল্লীতে খোদা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার কথা যদি শুনতে চাও তবে নিজের কাজ শুরু করে দাও। তাতে কিছু সুরাহাই হবে।"

খোদাবক্স শতরঞ্জির ওপর শুয়ে পড়ে বলল, "কাজ শুরু করার জন্যেও তো সামান্য কিছু পুঁজি চাই। ……খোদার নামে, এখন এ রকম দুঃখজনক কথা বল না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। সত্যি সত্যি আম্বালা ছেড়ে মস্ত ভুল করেছি। কিন্তু যা ঘটে তা আল্লাই ঘটান, তিনি আমাদের ভালোর জন্যেই করেন। জানি না, আর কতদিন কষ্ট সহ্য করার পর আমরা···"

সুলতানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "খোদার নামে কসম, তুমি কিছু কর। চুরি করে হোক ডাকাতি করে হোক আমাকে শালোয়ারের কাপড় এনে দাও। আমার কাছে সাদা বোস্কির কামিজের কাপড় আছে, তা আমি রঙ করিয়ে নেব। সাদা শিফনের একটা ওড়না আছে। দেয়ালির সময় তুমি আমাকে দিয়েছিলে। কামিজের সঙ্গে সেটাও আমি রঙ করে নেব। শুধু একটা শালোয়ার দরকার, তুমি যেমন করে পার তা জোগাড় করে দাও।···আমার

জানের কসম, যেমন করে পার এনে দাও। না এনে দিলে আমার শ্রাদ্ধ খাও।"

খোদাবক্স উঠে বলল, "তুমি শুধু কসম দিয়েই চলেছ।...বল আমি কোথা থেকে আনব...আফিম খাওয়ার জন্যে আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।"

—"যেমন করে পার আমাকে সাড়ে চারগজ কালো সাটিন এনে দাও।"

—"প্রার্থনা কর, আজ রাত্রে যেন আল্লা দু-তিন জনকে পাঠিয়ে দেন।"

—"তুমি কিছু করবে না।...তুমি ইচ্ছে করলে এ কটা পয়সা নিশ্চই জোগাড় করতে পার। যুদ্ধের আগে এই সাটিনের গজ ছিল বারো থেকে চোদ্দ আনা। এখন এক গজের দাম পাঁচশিকে। সাড়ে চার গজে কত টাকা লাগবে?"

—"তুমি যখন বলছ, আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করব।" বলে খোদাবক্স উঠে দাঁড়াল। "নাও এখন এসব ভুলে যাও। আমি হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসি।"

হোটেল থেকে খাবার এল। খেয়ে-দেয়ে দু'জনে শুয়ে পড়ল।

ভোরে খোদাবক্স পুরনো কেল্লার ফকিরের কাছে গেল, আর সুলতানা একলাই রইল। কিছুক্ষণ শুয়ে এবং ঘুমিয়ে কাটাল, তারপর ও ওর সাদা শিফনের ওড়নাএবং সাদা বোস্কির কামিজ বের করল এবং নীচে লণ্ড্রিতে রঙ করতে দিয়ে দিল। কাপড় ধোয়া ছাড়াও সেখানে রঙ করার কাজও হত। লণ্ড্রিতে রঙ করতে দিয়ে ও ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়তে লাগল। ম্যাগাজিনে ফিল্মের গল্প এবং গান দু-ই ছিল। ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে ও ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন চারটে বেজে গিয়েছিল, কারণ রৌদ্র তখন নর্দমার কাছে সরে গিয়েছিল। স্নান-টান করে যখন ও দেখল হাতে কোন কাজ-কর্ম নেই তখন ও গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে ব্যালকনিতে এসে

দাঁড়াল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ও ব্যালকনিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আলো জ্বলে উঠছিল। নীচের রাস্তায় ঝলমল আলোর রশ্মি চোখে এসে লাগছিল। শীতের ভাবটা একটু তীব্র হয়ে উঠল, এই তীব্রতা সুলতানার ভালোই লাগল। চলন্ত টাঙ্গা আর মটোরগুলিকে অনেক অনেকক্ষণ ধরে ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ ও শঙ্করকে দেখতে পেল। বাড়ির নীচে এসে সে ঘাড় উঁচু করে সুলতানার দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। সুলতানা বিনা দ্বিধায় তাকে ওপরে আসার জন্যে ডাকল।

শঙ্কর যখন ওপরে এল তখন সুলতানা খুব বিব্রত বোধ করল, কারণ শঙ্করকে সে কি বলবে। ও কোন চিন্তা ভাবনা না করেই তাকে ডেকেছিল। শঙ্করের মধ্যে এমন একটা স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক ভাব ছিল যেন এটা তার নিজের ঘর। প্রথম দিনের মতো আজকেও সে পাশ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সুলতানা যখন তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথাই বলল না, তখন সে নিজেই বলল, "তুমি আমাকে শ'বার ডাকতে পার আবার শ'বার চলে যেতে বলতে পার।···এই ধরনের কথায় আমি কখনও অসন্তুষ্ট হই না।"

সুলতানা খুব টালমাটালে পড়ে গেল। বলল, "না বসো, তোমাকে যেতে কে বলছে।"

ওর কথায় শঙ্কর হেসে দিল। বলল, "আমার শর্তে তুমি রাজী?"

—"কি শর্ত?" সুলতানা হেসে জিজ্ঞেস করল, "কেন আমাকে নিকা করছ নাকি?"

—"নিকা বিয়ে, কেন?" ····না তুমি নিকা করে সারা জীবন কারো সঙ্গে থাকবে, না আমি···এ সুখ আমাদের জন্যে নয়··· ছেড়ে দাও এই অসম্ভব ব্যাপার, কোন কাজের কথা বল।"

—"বলো, কি কথা বলব?"

—"তুমি মেয়ে মানুষ, এমন কথা বলো যাতে দিল বদলে যায়।

এই দুনিয়াতে শুধু দোকানদারি নেই, অন্য আরও কিছু আছে।”

সুলতানা মনে মনে শঙ্করকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বলল, “খোলাসা করে বলো, তুমি আমার কাছে কি চাও ?”

—“অন্যে যা চায় তাই-ই চাই।” বলে শঙ্কর উঠে বসল।

—“তবে তোমার সঙ্গে অন্যের পার্থক্য কোথায় রইল ?”

—“তোমার আর আমার মধ্যে কোন ফারাক নেই। ওদের সঙ্গে আমার আসমান আর জমিনের পার্থক্য। এমন অনেক কথা আছে, যা জিজ্ঞেস করা যায় না—বুঝতে হয়।”

সুলতানা বেশ কিছুক্ষণ ধরে শঙ্করের এই কথার মানে অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, “আমি বুঝতে পেরেছি।”

—“তবে বলো, তুমি কি বলতে চাও ?”

—“তুমি জিতে গিয়েছ, আমি হেরে গিয়েছি। কিন্তু আমি বলছি, আজ পর্যন্ত কেউ এমন কথা আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি।”

—“তুমি ভুল বলছ।···এই মহল্লায় খুঁজলেই তুমি এমন অনেক সহজ-সরল আর সাদাসিধে মেয়ে মানুষ হয়তো পাবে যারা বিশ্বাসই করতে পারবে না কোন মেয়ে তার পরাজয় এমনভাবে স্বীকার করতে পারে। আর যে পরাজয় তুমি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছ তারা তা মুখে স্বীকার না করলেও, তোমার এই সত্য হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে আছে। তোমার নাম সুলতানা না ?”

—“হ্যাঁ, সুলতানা।”

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল, “আমার নাম শঙ্কর··· আমার এই নামও এক অদ্ভুত—উটপটাঙ। যাক, চল, ভেতরে চল।”

শঙ্কর এবং সুলতানা যে ঘরে শতরঞ্চি বিছানো ছিল সে ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। কি কথায় তারা হাসছিল তা

কে জানে। কিন্তু শঙ্কর যখন চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল তখন সুলতানা তাকে বলল, "শঙ্কর, আমার একটা কথা রাখবে ?"

শঙ্কর বলল, "আগে বল, তারপর।"

সুলতানা কিছুটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল,"তুমি হয়তো বলবে আমি দাম উশুল করতে চাইছি, কিন্তু…"

—"বল, বলে ফেল…থামলে কেন ?"

সুলতানা সাহস সঞ্চয় করে বলল, "এমন কোন কথা নয়, মহরম আসছে, আমার কাছে এত পয়সা নেই যে কালো শালোয়ার বানাই। আমার এখানকার সমস্ত দুঃখের কথাতো তুমি শুনেছ। আমার কাছে যে কামিজ আর ওড়না ছিল তা আমি রঙ করতে দিয়ে দিয়েছি।"

শঙ্কর ওর কথা শুনে বলল,"তুমি চাও আমি তোমাকে কিছু টাকা দেই, আর সেই টাকা দিয়ে তুমি শালোয়ার তৈরী করাও।"

সুলতানা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, "না, আমি তা বলছি না, আমি বলছি যদি সম্ভব হয় তুমি আমাকে একটা শালোয়ার এনে দাও।"

শঙ্কর হাসল, "আমার পকেটে সংযোগ থেকেই কিছু সৃষ্টি হয়। তবু আমি চেষ্টা করব। মহরমের প্রথম দিনেই তুমি শালোয়ার পেয়ে যাবে। এখন খুশী তো ?" তারপর সে সুলতানার কানের দুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই দুল জোড়া তুমি আমাকে দেবে ?"

সুলতানা হেসে বলল, "এ তুমি কি করবে ? রূপোর সাধারণ দুল। খুব বেশী হলে পাঁচ টাকা দাম হবে।"

শঙ্কর বলল, "আমি তোমার কাছে দুল চেয়েছি,এর দাম জিজ্ঞেস করিনি। বল, দেবে কিনা ?"

"নিয়ে যাও।" বলে সুলতানা দুল খুলে শঙ্করকে দিয়ে দিল। দিয়ে ওর আফসোস হল, কিন্তু শঙ্কর তখন চলে গিয়েছিল।

সুলতানা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারেনি শঙ্কর তার কথা রাখবে। কিন্তু আট দিন পর, মহরমের প্রথম দিন সকাল ন'টায় ওর ঘরের দরজা কেউ খটখটাল। সুলতানা দরজা খুলে দেখল শঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে। খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিস সুলতানার হাতে দিয়ে বলল, "সাটিনের কালো শালোয়ার আছে···দেখে নিও, খুব সম্ভব লম্বা হবে···আমি এখন যাচ্ছি।"

শঙ্কর শালোয়ার দিয়ে চলে গেল। সুলতানার সঙ্গে আর বেশী কোন কথা বলল না। ওর প্যান্টে ক্রিজ পড়ে গিয়েছিল। চুল উস্কো-খুস্কো। দেখে মনে হচ্ছিল এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে সোজা এখানে এসেছে।

সুলতানা কাগজের মোড়ক খুলল। খুলে দেখল সাটিনের কালো শালোয়ার। মুখতারের কাছে যেমন শালোয়ার দেখেছিল হুবহু তেমনি। সুলতানা খুব খুশী হল। দুল আর সেই সওদার জন্যে ওর যে আফসোস ছিল তা দূর হয়ে গেল এই শালোয়ার এবং শঙ্করের ওয়াদা রাখার জন্যে।

দুপুরে ও নীচের লণ্ড্রি থেকে রঙ করানো কামিজ এবং ওড়না নিয়ে এল। শালোয়ার কামিজ এবং ওড়না যখন ও পরে নিল তখন দরজার কড়া ধরে কেউ নাড়ল। সুলতানা দরজা খুললে মুখতার ভেতরে এল। সে সুলতানার দিকে তাকিয়ে বলল, "কামিজ আর ওড়না তো দেখছি রঙ করা হয়েছে, কিন্তু এই শালোয়ার তো নতুন। ······কবে তৈরী করিয়েছ?"

সুলতানা বলল, "আজ দর্জি দিয়ে গিয়েছে।" বলতে বলতে ওর চোখ মুখতারের কানের ওপর পড়ল—"এই দুল তুমি কোত্থেকে নিয়েছ?"

মুখতার বলল, "আজকেই আনিয়েছি।"

এরপর দু'জনেই কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।

শাহদৌলার ইঁদুর

সলিমার যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স একুশ। তারপর পাঁচ বৎসর কেটে গিয়েছে, কিন্তু তার কোন ছেলেপেলে হয়নি। তাই মা এবং শ্বাশুড়ি খুব চিন্তিত। মার একটু বেশীই চিন্তা ছিল, কারণ সলিমার স্বামী নজিব আর একটা বিয়ে করে না ফেলে। বেশ কয়েকজন ডাক্তারের পরামর্শও নেওয়া হয়, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

সলিমার নিজেও খুব চিন্তিত ছিল। বিয়ের পর খুব কম মেয়েই আছে যার সন্তানের ইচ্ছা হয় না। সে তার মার সঙ্গে এ নিয়ে কয়েকবার পরামর্শও করেছে। মার বুদ্ধি মতো চলেও কোন লাভ হয়নি।

একদিন তার এক বান্ধবী, যাকে বাজা বলা হত, সলিমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার কোলে একটা নাদুস-নুদুস ছেলে দেখে সলিমা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। সলিমা তার সেই আশ্চর্য ভাব নিয়েই জিজ্ঞেস করল, "ফাতেমা, তোমার এই ছেলে কেমন করে হল?"

বয়সে ফাতেমা তার থেকে পাঁচ বৎসরের বড় ছিল। সে মুচকি হেসে বলল, "এ হচ্ছে শাহদৌলা সাহেবের মেহেরবানি। একজন মহিলা আমাকে বলে, তুমি যদি সন্তান চাও তবে গুজরাটে গিয়ে শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করে বল, "আমার প্রথম যে বাচ্চা হবে তা আপনার মাজারে উৎসর্গ করব।"

সলিমাকে সে আরও বলল যে শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করার পর প্রথম যে বাচ্চা হবে তার মাথা খুব ছোট হয়। ফাতেমার এই কথা সলিমার ভালো লাগল না। কিন্তু সে নজিবকে

বলল যে প্রথম বাচ্চা যদি শাহদৌলা সাহেবের গর্তে দিয়ে আসতে হয় তবে তা খুবই দুঃখজনক।

সে মনে মনে ভাবল, এমন কোন্ মা আছে যে নিজের বাচ্চার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে আলাদা হয়ে থাকবে। তার মাথা ছোট হোক, নাক চ্যাপ্টা হোক, চোখ কানা হোক—মা তাকে কিছুতেই দুর্দশার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। যাই-ই করতে হোক না কেন, সন্তান তার চাই-ই। তাই সে তার চেয়ে বয়সে বড় বান্ধবীর কথা স্বীকার করে নিল। কারণ যে গুজরাটে শাহদৌলার মাজার সেখানকার সে মেয়ে ছিল। সে তার স্বামীকে বলল, "ফাতেমা বারবার বলছে গুজরাটে আমার সঙ্গে চল। তুমি যদি বল তবে ওর সঙ্গে যাই।" তার স্বামীর এতে কি আপত্তি থাকতে পারে! তাই সে বলল, "যাও, তবে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এস।"

সে ফাতেমার সঙ্গে গুজরাটে চলে গেল।

সে যেমন ভেবেছিল তা নয়। শাহদৌলার মাজার বহু মূল্য পাথরে তৈরী ছিল না। বেশ খোলা-মেলা জায়গায় ছিল। সলিমার খুব ভালো লাগল। কিন্তু এক ভিড়ের মধ্যে সে শাহদৌলার ইঁদুর দেখতে পেল। তার নাক দিয়ে সিকনি পড়ছিল। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই ছিল না। দেখে সালিমা শিউরে উঠল।

তার সামনেই একটি যুবতী দাঁড়িয়েছিল। যৌবন তার সারা শরীরে টলমল করছিল, কিন্তু সে এমন ভাব ভঙ্গী করছিল যে খুব গম্ভীর মানুষও না হেসে থাকতে পারবে না। তাকে দেখে সলিমা মুহূর্তের জন্যে হাসল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জলে ভরে উঠল। ভাবতে লাগল, না জানি এ মেয়ের কি হবে? এখানকার মালিক একে কারো কাছে বিক্রি করে দেবে। আর সে তাকে বাঁদর সাজিয়ে নানান জায়গায় ঘোরাবে। এই হতভাগী তার রুজির উপায় হবে।

মেয়েটির মাথা খুব ছোট ছিল। সে ভাবল মাথা ছোট হলে তো মানুষের ভাগ্য আর ছোট হয় না। পাগলদেরও তো মাথা আছে।

শাহদৌলার এই মেয়ে ইঁদুরটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তার প্রতিটি অঙ্গ ছিল নিখুঁত। মনে হচ্ছিল তার চেতনা শক্তি ইচ্ছে করেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সে এমন ভাবে হাঁটা-চলা করছিল এবং হাসছিল যেন কলের একটা খেলনা। সলিমার মনে হচ্ছিল এই উদ্দেশ্যের জন্যেই তাকে এমন করা হয়েছে।

কিন্তু এসব অনুভব সত্ত্বেও সে তার বান্ধবী ফাতেমার কথা মতো শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করল, তার বাচ্চা হলে সে তাকে এখানে উৎসর্গ করবে।

ডাক্তারের চিকিৎসা সলিমা বন্ধ করল না। দু মাস পর বাচ্চা হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। সে খুব খুশী হল। সময় মতো তার একটা ছেলেও হল। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। গর্ভবতী হওয়ার সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। তাই ছেলেটির ডান গালে ছোট্ট একটা কালো দাগ ছিল, যে দাগটির জন্যে ছেলেটিকে দেখতে খারাপ লাগত না।

ফাতেমা এসে বলল,"বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি শাহদৌলা সাহেবকে দিয়ে দেওয়া উচিত। সলিমা নিজেও তা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে টালবাহানা করতে লাগল। তার মন কিছুতেই মানছিল না কি ভাবে সে তার চোখের মনি এই ছেলেকে ছুঁড়ে দিয়ে আসে।

তার যুক্তি ছিল, শাহদৌলা সাহেবের কাছে যে সন্তান চায় তার সেই প্রথম সন্তানের মাথা ছোট হয়। কিন্তু তার ছেলের মাথা তো বেশ বড়সর। ফাতেমা তাকে বলল, "সব সময় যে তা হবে এমন কোন কথা নয়, তুমি মিছেমিছি বাহানা করছ। তোমার বাচ্চার ওপর শাহদৌলা সাহেবে হক আছে। এর ওপর তোমার

কোন অধিকার নেই। তুমি যদি তোমার কথা না রাখ, তবে তোমার ওপর এমন গজব হবে যে তুমি জীবনে তা ভুলতে পারবে না।"

দুঃখে ভরপুর হৃদয় নিয়ে সলিমা তার নাদুস-নুদুস ছেলেকে, যার ডান গালে একটা ছোট্ট তিল ছিল—গুজরাটে গিয়ে শাহদৌলা সাহেবের মাজারের সেবকদের হাতে তুলে দিতে হল।

সে খুব কাঁদল। দুঃখে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এক বৎসর ধরে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে টানা পোড়ন চলল। সে তার সন্তানের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। বিশেষ করে ডান গালের কালো তিলের কথা সলিমার বারবার মনে পড়ছিল, যে তিলের ওপর হামেশাই সে চুমু দিত। কারণ এ তিল তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল।

এই সময়টুকুর মধ্যে সে এক মুহূর্তের জন্যেও তার সন্তানকে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। সে অদ্ভুত ধরণের সব স্বপ্ন দেখত। শাহদৌলা ইঁদুরের রূপ নিয়ে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলত। তার শরীরের মাংসকে তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কাটত। সে চীৎকার করে তার স্বামীকে বলত, "আমাকে বাঁচাও, ইঁদুর আমার মাংস কাটছে।"

কখনও কখনও বা তার উদ্বিগ্ন মস্তিষ্কে মনে হতে তার সন্তান ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। সে যেন তার লেজ টেনে ধরে আছে। কিন্তু গর্তের মধ্যে যে বড় বড় ইঁদুরগুলো আছে, তারা তার থুথনি কামড়িয়ে ধরেছে। আর তাই সে তাকে টেনে বাইরে বের করতে পারছে না।

কখনও কখনও বা সে সেই মেয়েটিকে মানস চোখে দেখতে পেত। পরিপূর্ণ যৌবনে-ভরা সেই মেয়েটি—যাকে সে শাহদৌল্লার মাজারের কাছে দেখেছিল। সলিমা হাসতে শুরু করে দিত। কিন্তু একটু পরেই সে কাঁদতে লাগত। সে এমন কাঁদতে শুরু করত যে তার স্বামী নজিব বুঝতে পারত না কিভাবে সে তার কান্না থামাবে।

সলিমা বিছানার ওপর রান্না ঘরে বাথরুমে সোফার ওপর

হৃদয়ে কানে সব জায়গাতেই ইঁদুর দেখতে লাগল। কখনও কখনও বা নিজেকেই তার ইঁদুর বলে মনে হত। তার নাক থেকে সিকনি ঝরছে। সে শাহদৌল্লার মাজারের বাসিন্দাদের মধ্যে তার ছোট্ট—খুব ছোট্ট দুর্বল মাথা নিয়ে এমন ভাব-ভঙ্গী করছে যে দেখে তারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তার অবস্থা খুব দুঃখজনক হয়ে উঠল।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই সে কালো কালো দাগ দেখতে লাগল। জ্বর একটু কমলে সলিমার শরীর কিছুটা সুস্থ হল। নজিব খানিকটা আশ্বস্ত হল। সে সলিমার অসুখের কারণ জানত। নজিব খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিল। প্রথম সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্যে তার কোন দুঃখ ছিল না। যা কিছু ঘটেছিল তা সে মেনে নিয়েছিল। সে বিশ্বাস করত তার যে ছেলে হয়েছিল তা তার নয়, শাহদৌলা সাহেবের।

সলিমার জ্বর একেবারে কমে গেলে এবং মন ও মস্তিষ্কের ঝড় থেমে গেলে নজিব তাকে বলল, "সলিমা, নিজের বাচ্চার কথা ভুলে যাও, ও আমাদের দুঃখের ধন ছিল।"

সলিমা খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, "কিন্তু মন যে মানছে না। সারা জীবন ধরে নিজের মমতাকে ধিক্কার দিয়েই চলব, কারণ আমি আমার চোখের মনিকে মাজারের চাকরের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এযে কত বড় পাপ! চাকর কখনও মা হতে পারে না।"

একদিন সে পালিয়ে সোজা গুজরাটে চলে গেল। এবং সাত-আট দিন সেখানে থাকল। সে তার বাচ্চার খোঁজ-খবর করল। কিন্তু কোন খবর পেল না। নিরাশ হয়ে সে ফিরে এসে তার স্বামীকে বলল, "আমি আর ওর কথা কখনও ভাবব না।"

কিন্তু সে ওর কথা ভুলতে পারল না। মনে মনে ভাবত। তার বাচ্চার ডান গালের দাগ তার হৃদয়ের দাগ হয়ে রইল। এক বৎসর পর তার এক মেয়ে হল। তার চেহারা হুবহু তার প্রথম সন্তানের

মতো ছিল। শুধু ওর ডান গালে কোন তিল ছিল না। তার নাম সে মুজিবা রাখল, কারণ প্রথম সন্তানের নাম সে মুজিব রাখবে ভেবেছিল। যখন তার মাস দুই বয়স তখন একদিন সলিমা সুর্মাদানী থেকে সুরমা নিয়ে তার ডান গালে একটা তিল এঁকে দিল। আর মুজিবের কথা ভেবে কাঁদতে লাগল। দু'গাল বেয়ে যখন জল গড়াতে লাগল তখন সে তা তার ওড়না দিয়ে মুছে হাসতে লাগল। সে তার দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিল।

এরপর সলিমার আরও দুটি ছেলে হয়। তার স্বামী খুব খুশী ছিল।

একবার তার এক বান্ধবীর বিয়ে উপলক্ষে সলিমাকে গুজরাটে যেতে হয়েছিল। এই সুযোগে সে আর একবার মুজিবের খোঁজ-খবর নিল। কিন্তু কোন খবর পেল না। সে ভাবল, হয়তো মারা গিয়ে থাকবে। তাই বৃহস্পতিবার সে খুব ধুমধাম করে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করল।

আশ-পাশের সমস্ত মহিলারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, সে কার জন্যে এমন ঝঞ্ঝাট করছে। কেউ কেউ সলিমাকে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু সে কাউকে কোন জবাব দিল না।

সন্ধ্যার সময় সে তার দশ বৎসর বয়সের মেয়েকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। সুরমা দিয়ে তার ডান গালে তিল দিয়ে সেই তিলের ওপর খুব চুমু খেতে লাগল।

মুজিবাকে সে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে মনে করত। এখন থেকে সে তার কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিল। তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর ওর মনের বোঝা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। সে তার হৃদয়ের দুনিয়াতে তার কবরও রচনা করে নিয়েছিল। আর সেই কবরের ওপর সে তার ভাবনার ফুল ছড়িয়ে দিতে লাগল।

তার তিন ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করত। প্রতিদিন ভোরে সলিমা তাদের তৈরী করে দিত। তাদের জন্যে জলখাবার বানাত।

তাদের প্রত্যেককে এক এক করে দেখত। স্কুলে চলে যাওয়ার পর মুহূর্তের জন্যে তার মুজিবের কথা মনে পড়ত। যদিও সে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছিল—তার হৃদয়ের বোঝা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, তবুও মাঝে মাঝে তার মনে হত মুজিবের ডান গালের কালো তিল তার মন জুড়ে বসে আছে।

একদিন তার তিন ছেলে-মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে তাকে বলল, "আম্মা, আমরা তামাশা দেখব।"

সে খুব স্নেহের সঙ্গে বলল, "কি তামাশা ?"

সবচেয়ে বড় মেয়ে বলল, "আম্মা, একটা লোক কি সুন্দর তামাশা দেখাচ্ছে।"

সলিমা বলল, "যাও ওকে ডেকে আন। ঘরের মধ্যে যেন না আসে, বাইরেই যেন তামাশা দেখায়।"

বাচ্চারা দৌড়ে সেই লোকটাকে ডেকে এনে তামাশা দেখতে লাগল। খেলা শেষ হয়ে গেলে মুজিবা তার মার কাছে গেল পয়সা আনতে। মা পার্স খুলে চার আনা বের করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সদর দরজার কাছে গিয়ে সে দেখল শাহদৌলার ইঁদুর এক বিচিত্র মুদ্রায় নিজের মাথা দুলিয়ে চলেছে। সলিমার হাসি পেয়ে গেল।

দশ-বারোটি বাচ্চা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা এমন হট্টগোল করছিল যে কোন কথাই শোনা যাচ্ছিল না। সলিমা চার আনা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। শাহদৌলার সেই ইঁদুরের হাতে পয়সা দিতে গিয়ে এক ঝটকায় সে পিছনে সরে এল, যেন বিদ্যুতের তারে সে হাত দিয়েছে। সেই ইঁদুরের ডান গালে একটা কালো তিল ছিল। সলিমা খুব ভালোভাবে তাকে দেখল। তার নাক দিয়ে সিকনি ঝরছিল। মুজিবা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে তার মাকে বলল, "আম্মা,—এই—এই ইঁদুরের মুখের সঙ্গে আমার মুখের কি মিল, তাই না ? আমি কি ইঁদুর ?"

সলিমা শাহদৌলার সেই ইঁদুরের হাত চেপে ধরে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে তাকে চুমু দিল—তাকে আদর করল। সে ছিল তার মুজিব। কিন্তু সে এমন ভঙ্গী করছিল যে সলিমার দুঃখের হৃদয়েও হাসি এসে থেমে যাচ্ছিল।

সে মুজিবকে বলল, "খোকা, আমি তোমার মা।"

শাহদৌলার ইঁদুর খুব জোরে হেসে উঠল। নাকের সিকনি জামার আস্তিন দিয়ে মুছে তার মার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "একটা পয়সা।" মা পার্স খুলল, কিন্তু তার দু'চোখ আগেই জলে ভরে গিয়েছিল। সে একশ' টাকার নোট বের করে বাইরে গিয়ে যে তার ছেলেকে নিয়ে তামাশা দেখাচ্ছিল সেই লোকটাকে দিল। সে এত কম টাকা নিয়ে তার রুটি-রুজিকে বিক্রী করতে অস্বীকার করল। অবশেষে সলিমা তাকে পাঁচশ' টাকায় রাজী করাল। টাকা দিয়ে সে ভিতরে এসে দেখল মুজিব সেখানে নেই। মুজিবা তাকে বলল সে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

সলিমার অন্তর চীৎকার করে বলতে লাগল, মুজিব ফিরে এস। কিন্তু সে এমন ভাবে হারিয়ে গেল যে আর কখনও ফিরে এল না।

স্বরাজের জন্যে

কোন্ সাল তা আমার ঠিক মনে নেই। তবে সেই দিনগুলি শুধু 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সারা অমৃতসর গমগম করত। এই শ্লোগান আমি ভুলতে পারিনি, কারণ এই শ্লোগানে এক অদ্ভুত জোস—এক অদ্ভুত ধরণের যৌবনের মাদকতা ছিল। সেই জোস সেই মাদকতা ছিল অনেকটা অমৃতসরের ঘুটেওয়ালীদের মতো, যারা মাথায় টুকরি নিয়ে বাজারে যেত তা বিক্রির জন্যে। দিনগুলি সত্যিই সুন্দর ছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের সারা পরিবেশে এতদিন যে রক্তাক্ত ঘটনার ভয় জমাট বেধে ছিল তা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। আজ সেখানে চলেছে এক নির্ভীক তড়পানি। যে তড়পানি ছিল উদ্দেশ্যহীন দৌড়-ঝাঁপের মতো—যার কোন মঞ্জিল —কোন নিশানা ছিল না।

মানুষ শ্লোগান দিত, মিছিল বের করত আর শয়ে শয়ে গ্রেফতার হয়ে যেত। এ এক সুন্দর গ্রেফতার গ্রেফতার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকালে গ্রেফতার করা হত আর সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হত। মোকদ্দমা চলত, কয়েক মাস জেলে কাটিয়ে বেরিয়ে আসত। আবার শ্লোগান দিত, আবার জেলে যেত।

দিনগুলি ছিল জীবনে ভরপুর। একটা ছোট্ট বুদবুদ ফাটলেও তা ঘুর্ণিপাকে পরিণত হত। কেউ চকে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলল, "হরতাল করতে হবে," সঙ্গে সঙ্গে হরতাল হয়ে গেল। হঠাৎ এক গুঞ্জনের ঢেউ উঠল, প্রত্যেককে খাদি পরতে হবে। খাদি পরলে ল্যাঙ্কশায়ারের সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কাপড় বয়কট আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। আর প্রতিটি চকে আগুন জ্বলতে লাগল। মানুষ সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা থেকে কাপড়

খুলে সেই আগুনে ছুঁড়ে দিতে লাগল। কোন কোন মহিলারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের অপছন্দ শাড়িগুলি ছুঁড়ে দিত, আর ভিরের লোকজন তালি মেরে মেরে হাত লাল করে তুলত।

আমার মনে আছে, কোতয়ালির সামনে, টাউন হলের কাছে এক অগ্নি উৎসব চলছিল। আমার সহপাঠী শেখু উৎসাহে তার রেশমের কোট খুলে কাপড়ের এই জ্বলন্ত চিতায় দিয়ে দিল। তালির সমুদ্র গর্জন করে উঠল। কারণ শেখু ছিল এক 'টোডি বাচ্চার' ছেলে। তালির গর্জনে শেখুর জোস বেড়ে গেল। বোস্কির জামা খুলে সে আগুনে উৎসর্গ করল। পরে তার মনে পড়ে গেল ঐ জামার সঙ্গে সোনার বোতাম ছিল।

আমি শেখুকে নিয়ে ঠাট্টা করছি না। সেই সব দিনগুলিতে আমার অবস্থাও এই রকম ছিল। মনে হত, হাতে যদি একটা পিস্তল থাকত তবে আমি বিপ্লবী পার্টি বানিয়ে ফেলতাম। বাবা সরকারী পেনসন পেতেন, কিন্তু সে কথা আমি কোন দিন ভাবিনি। আমার ভেতরে এক অদ্ভুত ধরণের উত্তেজনা টগবগ করত। ফ্ল্যাস খেলার সময় যে ধরণের উত্তেজনা টগবগ করে অনেকটা সেই রকম।

স্কুল সম্পর্কে আমার তেমন কোন মমতা ছিল না, তাই পড়া-শোনার সঙ্গে আমার বেশ শত্রুতা সৃষ্টি হল। বাড়ি থেকে বই-খাতা নিয়ে বেরিয়ে জালিয়ানওয়ালা বাগে যেতাম। স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত কোন গাছের ছায়ায় বসে বসে সেখানকার সরগরম দেখতাম বা দূরের বাড়িগুলোর জানালায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম এদেরই মধ্যে কোন একজনের সঙ্গে আমার প্রেম হবে। কেন এ ধরণের চিন্তা আমার মাথায় আসত তা আমি জানি না।

জালিয়ানওয়ালা বাগ তখন খুব জাঁকজমকে ভরা ছিল। চারদিকে লাইনবন্দী তাবু আর সামিয়ানা খাটানো থাকত। সবচেয়ে বড় সামিয়ানাতে দু' একদিন পরপরই এক একজনকে ডিকটেটর করে

বসিয়ে দেওয়া হত। আর সেই ডিকটেটরকে সমস্ত স্বয়ংসেবকরা কুর্ণিশ করত। দু-তিন দিন বা খুব বেশী হলে দশ-পনেরো দিন সেই ডিকটেটর খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে খদ্দরের পোষাক-পরা মহিলা এবং পুরুষদের কাছ থেকে কুর্ণিশ আদায় করত। লঙ্গরখানার জন্যে শহরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাল এবং আটা সংগ্রহ করত। জালিয়ানওয়ালা বাগে এত আম থাকতে খোদাই জানে তারা কেন এই লপসি খেত আর হঠাৎ একদিন গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় চলে যেত।

আমার এক সহপাঠী ছিল—নাম শাহজাদা গুলাম আলী। আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কত গভীর ছিল তা শুধু আপনারা এর থেকেই সহজে আন্দাজ করতে পারবেন। আমরা দু'জনে দু' দু'বার একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছিলাম,আর একবার আমরা পালিয়ে বোম্বাই গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল রাশিয়াতে যাব, কিন্তু পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের ফুটপাতে কাটাতে হয়েছিল, তাই ক্ষমা চেয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে ফিরে আসতে হয়।

শাহজাদা গুলাম আলীর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। লম্বা, গায়ের রঙ কাশ্মীরীদের মতো লাল টকটকে। তীক্ষ্ণ নাক, টানা টানা চোখ। চালচলনে এমন এক আভিজাত্য ছিল যে সেই আভিজাত্যে পেশোয়ারী গুণ্ডাদের মেজাজের এক হাল্কা আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠত।

আমার সঙ্গে সে যখন স্কুলে পড়ত তখন সে শাহজাদা ছিল না। কিন্তু শহরে যখন ইনক্লাবের হৈ চৈ পড়ে গেল তখন সে দশ পনেরোটা সমাবেশ এবং মিছিলে যোগ দিল। শ্লোগান দিয়ে, গলায় গাদা ফুলের মালা পরে, প্রেরণাদায়ক গান গেয়ে এবং স্বয়ং-সেবকদের সঙ্গে প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনা করে সে এক আধ-পাকা বিপ্লবীতে পরিণত হল। একদিন যে নিজেই বক্তৃতা দিল। পরের দিন খবরের কাগজ দেখে আমি বুঝতে পারলাম গুলাম আলী শাহজাদা হয়ে গিয়েছে।

শাহজাদা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলাম আলী সারা অমৃতসরে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। ছোট শহরে সুনাম আর দুর্নাম ছড়াতে বেশী দেরী লাগে না। অমৃতসরের সমস্ত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হচ্ছে তারা খুব সমালোচক। একজন আর একজনের দোষ এবং কলঙ্ক খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের ব্যাপারে তারা একেবারে অন্য মানুষ। আসলে তাদের জন্যে সবসময় বক্তৃতা এবং আন্দোলনের প্রয়োজন। আপনি তাদের নীলবর্ণ ই বানান আর মসি বর্ণই বানান তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। একই নেতা শুধু চোগা-চাপকান পালটিয়ে অমৃতসরে বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন।

কিন্তু সেই দিনগুলি ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বড় বড় নেতারা সব জেলে ছিলেন। ফলে তাঁদের গদিগুলি খালি পড়ে ছিল। সেই সময় নেতাদের অভাব মানুষ তত বেশী করে অনুভব করত না। যে আন্দোলন তখন চলছিল তার জন্যে এমন সব মানুষের প্রয়োজন ছিল, যারা দু-একদিন খদ্দরের জামা কাপড় পরে জালিয়ানওয়ালা বাগে সামিয়ানার নীচে বসে দু-একটা ভাষণ দিতে পারে এবং ভাষণ দেওয়ার পর গ্রেফতার হতে পারে।

তখন ইউরোপে সবে ডিকটেটরসিপ চালু হয়েছিল। হিটলার আর মুসোলিনীর নাম-ডাক শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এর ফলশ্রুতি হিসেবে কংগ্রেসও ডিকটেটর তৈরী করতে শুরু করল। শাহজাদা গুলাম আলীর সময় আসার আগে চল্লিশ জন ডিকটেটর গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল।

আমি যখন বুঝতে পারলাম গুলাম আলী ডিকটেটর হয়ে গিয়েছে, তখন আমি তড়িঘড়ি করে জালিয়ানওয়ালা বাগে হাজির হলাম। বড় সামিয়ানার নীচে স্বয়ং সেবকদের পাহারা বসানো ছিল। কিন্তু গুলাম আলী আমাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে ডেকে নিল—মাটিতে একটা গদি পাতা ছিল, আর তার ওপর একটা

খদ্দরের চাদর বিছানো ছিল। আর এই গদির ওপর একটা পাশ বালিশে হেলান দিয়ে শাহজাদা গুলাম আলী জনা কয়েক খদ্দরের পোশাক-পরা ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা-বার্তা বলছিল। খুব সম্ভব তরি-তরকারি নিয়ে আলোচনা চলছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা শেষ করে শাহজাদা স্বয়ং সেবকদের হুকুম দিল। হুকুম দিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। তার এই অসাধারণ গাম্ভীর্য দেখে আমার ফিকফিক করে হাসি পাচ্ছিল। স্বয়ং সেবকরা চলে গেলে আমি হেসে বললাম, "এই শালা শাহজাদা।"

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলাম, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম গুলাম আলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এই পরিবর্তন তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে-ছিল। কয়েকবার সে আমাকে বলল, "সাদত, এমন হাসি-ঠাট্টা করো না। আমি জানি আমার বুদ্ধি তেমন নেই, কিন্তু যে ইজ্জত আমি পেয়েছি তা তুলনাহীন, তাই আমি এই টুপি পরে থাকতে চাই।"

তারপর সে আমাকে বড় গ্লাসের এক গ্লাস দই-এর লস্যি খাওয়াল। সন্ধ্যার সময় তার ভাষণ শুনতে আসব বলে কথা দিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যার সময় জালিয়ানওয়ালা বাগ লোকে থৈ থৈ করছিল। আমি একটু আগে-ভাগেই এসেছিলাম বলে স্টেজের কাছে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। হাত তালির সঙ্গে সঙ্গে গুলাম আলী স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াল। সাদা ধবধবে খাদির পোশাক পরে থাকার জন্যে তাকে আরও সুন্দর এবং আকর্ষক মনে হচ্ছিল। যে মেজার কথা আমি আগে বলেছি সেই মেজাজ বারবার ঝিলিক দিচ্ছিল বলে তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সে এক নাগারে বলে চলল,—এর মধ্যে কয়েকবার আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। শুনতে শুনতে দু-একবার আমার মনে হয়েছিল আমি বোমার মতো ফেঁটে

পড়ি। খুব সম্ভব সেই সময় আমার মনে হয়েছিল ফেঁটে গেলে হিন্দুস্থান স্বাধীন হয়ে যাবে।

একমাত্র খোদাই জানে কত বৎসর কেটে গিয়েছে। সেই সময়কার ভাবনা এবং ঘটনাগুলি কিভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তা এত বৎসর পর হুবহু তুলে ধরা খুবই মুশকিল। কিন্তু এই গল্প লেখার সময় যখন গুলাম আলীর ভাষণের কথা মনে পড়ছে তখন গোটা একটা তারুণ্য যেন আমার সামনে ভেসে উঠছিল। রাজনীতিতে সেই তারুণ্য ছিল পবিত্র, ছিল সাচ্চা নির্ভীকতা। তা যেন পথ-চলতি কোন মেয়ের হাত ধরে বলেছিল, 'আমি তোমাকে পেতে চাই।' কিন্তু পরক্ষণেই যেন আইনের নাগপাশে গ্রেফতার হয়ে গেল। এই ভাষণের পর আমার ওর আর দু-একটি ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছিল। ওর আধ-পাকা পাগলামী উঠতি যৌবন বাচালতা দাড়ি-গোঁফহীন আহ্বান,যে আহ্বান আমি গুলামআলীর কণ্ঠে শুনেছিলাম, তার সামান্যতম গুঞ্জনও আজ আর শোনা যায় না। এখন যে ভাষণ শুনি তা হচ্ছে ঠাণ্ডা গম্ভীরতায় ভরপুর—পুরনো রাজনীতি এবং কাব্যিক কাব্যিক ভাবে জড়ানো।

আসলে সেই সময় দুটি পার্টিই কাঁচা ছিল। সরকারও কাঁচা ছিল —প্রজাও। ফলে কেউ কাউকে পরওয়া না করে পরস্পরের খটাখটি লেগেছিল। সরকার জেলখানার গুরুত্ব না বুঝে লোককে বন্দী করে চলেছিল—তারাও ধরা দিচ্ছিল। জেলখানায় যাওয়ার আগে জেলখানায় তারা কেন যাচ্ছে তাও জানত না।

এ এক ধোকা ছিল, সেই ধোকার মধ্যে আগুনের এক আভাসও ছিল। মানুষ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছিল—নিভছিল, আবার জ্বলে উঠছিল। এই জ্বলা আর নেভা, নেভা আর জ্বলা গোলামীর বৈরাগ্য উদাস এবং হাই-তোলার মধ্যে এক উষ্ণ কম্পন সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

গুলাম আলীর ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা জালিয়ানওয়ালা

বাগ জোর জোর তালি এবং শ্লোগানের আগুনে জ্বলে উঠেছিল।ওর মুখ জ্বল জ্বল করছিল। আমি যখন আলাদাভাবে ওর সঙ্গে দেখা করলাম এবং ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিলামতখন ও থরথর করে কাঁপছিল। ওর এই উষ্ণ কম্পন ওর উজ্জ্বল মুখের চেয়েও উত্তপ্ত ছিল। ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ওর দুই চোখে উৎসাহ-দীপ্ত ভাবনার দমক ছাড়াও এক শ্রান্ত চাহনি আমি দেখতে পেলাম—যেন ও কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার হাত থেকে নিজের হাতকে ছাড়িয়ে নিয়ে ও চামেলি ঝাড়ের নিচে এগিয়ে গেল।

চামেলি ঝাড়ের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে সাদা ধবধবে খদ্দের শাড়ি।

পরের দিন আমি বুঝতে পারলাম শাহজাদা গুলাম আলী প্রেমের ফাঁদে আটকা পড়েছে। আমি যে মেয়েটিকে চামেলি ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম তার সঙ্গে ও প্রেম করছিল। এ এক তরফা প্রেম ছিল না, নিগারও ওর প্রেম পাগল হয়ে উঠেছিল। নিগার নাম থেকে বোঝা যায় সে ছিল মুসলমান। অনাথ। মেয়েদের হাসপাতালে নার্সের কাজ করত, খুব সম্ভব অমৃতসরে প্রথম মুসলমান মেয়ে যে বোরখা ফেলে দিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

খদ্দরের কাপড় পরে, কিছুটা কংগ্রেসের সরগরমে যোগ দেওয়াতে এবং হাসপাতালে কাজ করার দরুন নিগারের ইসলামী প্রকৃতি অর্থাৎ সেই উগ্র জিনিস যা মুসলমান মেয়েদের স্বভাবে লীন হয়ে আছে তা কিছুটা পরিমাণে নষ্ট হয় গিয়েছিল—কিছুটা নম্র হয়ে গিয়েছিল।

দেখতে ও সুন্দর ছিল না, কিন্তু নারীত্বের অনিন্দ্যসুন্দরতা নম্রতা ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় ও ছিল ভরপুর। আদর্শ হিন্দু মেয়েদের যে স্বভাব তা নিগারের মধ্যে অল্প-বিস্তর ঝিলিক দিচ্ছিল

এবং যা তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে রক্তের উষ্ণতা সঞ্চার করার জন্যে রঙ ভরে দিয়েছিল। খুব সম্ভব নিগারকে নিয়ে আমি সেই সময় এমন করে ভাবিনি। কিন্তু এখন লেখার সময় যখন আমি নিগারকে নিয়ে কল্পনা করছি তখন ওকে নমাজ আর আরতীর 'এক হৃদয়-সঙ্গম বলে আমার মনে হচ্ছে।

ও শাহজাদা গুলাম আলীর পূজা করত আর শাহজাদা ওর জন্যে জান দিয়ে দিত। নিগারকে নিয়ে আমি যখন ওর সঙ্গে কথা বলি তখন জানতে পারি কংগ্রেসের আন্দোলনের জন্যে ওদের দুজনের পরিচয় হয়। আর পরিচয়ের অল্প দিনের মধ্যে ওরা দুজন জনের হয়ে যায়।

গুলাম আলীর ইচ্ছা ছিল জেলে যাওয়ায় আগে ও নিগারকে বিয়ে করে। আমার এখন ঠিক মনে নেই, জেলে যাওয়ার আগে ও কেন বিয়ে করতে চেয়েছিল। জেল থেকে ফিরে এসেও তো বিয়ে করতে পারত। সেই সময় তো খুব বেশী দিন জেল হত না। খুব কম হলে তিন মাস আর বেশী হলে এক বৎসর। অনেককে তো পনেরো-বিশ দিন পরেই ছেড়ে দেওয়া হত, যাতে অন্য কয়েদীদের জায়গার অভাব না হয়। যাই হোক ওর নিজের ইচ্ছা নিগারের ওপরও প্রভাব ফেলেছিল এবং নিগারও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। শুধু মাত্র বাবাজীর কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নেওয়াটাই বাকী ছিল।

বাবাজী সম্পর্কে আপনি যাই জানুন না কেন, তাঁর ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। শহরের বাইরে লাখপতি সরাফ হরিরামের জাঁকজমক বাড়িতে তিনি উঠতেন। পাশের এক গ্রামে 'তিনি যে আশ্রম করেছিলেন সাধারণত সেখানেই থাকতেন, কিন্তু অমৃতসরে এলে তিনি হরিরাম সরাফের বাড়িতে থাকতেন। আর বাবাজী এলেই তাঁর ভক্তদের কাছে এই বাড়ি পবিত্র হয়ে উঠত। সারাদিন দর্শন প্রার্থীদের ভিড়ে জমজমাট বেঁধে থাকত। প্রতিদিন বিকালের